ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

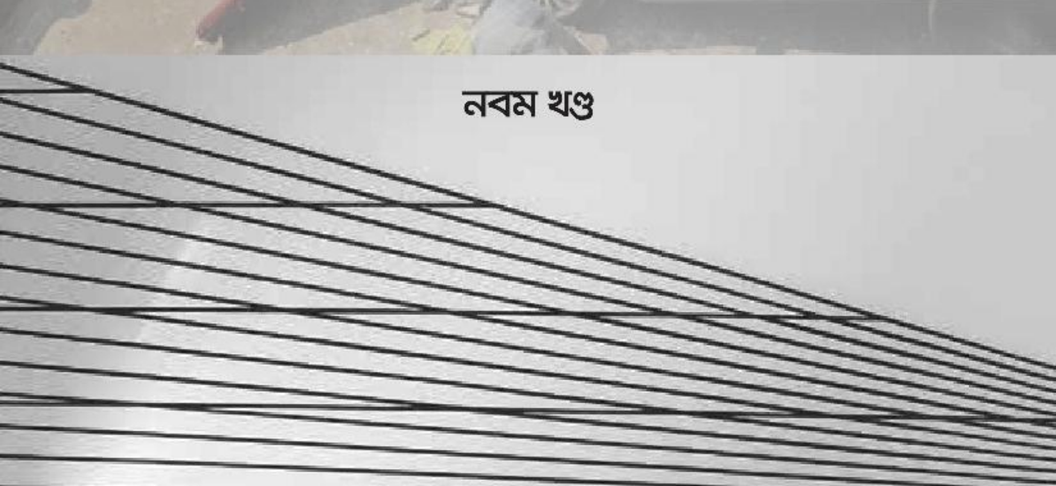

নবম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

নবম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়

(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন)

নবম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা – নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : মোহাম্মদ আসাদ

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-6022-6

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান

পার্লামেন্ট ওয়াচ : দশম জাতীয় সংসদ (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন) ১৩
মোরশেদা আক্তার, নিহার রঞ্জন রায় ও অমিত সরকার

বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ২৭
শাম্মী লায়লা ইসলাম, নাজমুল হুদা মিনা ও নাহিদ শারমীন

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ৫১
শাহজাদা এম আকরাম, জুলিয়েট রোজেটি, নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৬৭
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, নিহার রঞ্জন রায়, মো. মোস্তফা কামাল ও নাজমুল হুদা মিনা

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায় : নারীর ভূমিকা, ঝুঁকি ও করণীয় ৮৩
শাম্মী লায়লা ইসলাম ও শাহজাদা এম আকরাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেবা খাত ও প্রতিষ্ঠান

সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ ৯৯
মো. ওয়াহিদ আলম, ফারহানা রহমান, মোহাম্মদ নূরে আলম, মো. জুলকারনাইন, কুমার বিশ্বজিত দাশ ও নাজমুল হুদা মিনা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১১৭
তাসলিমা আক্তার ও মো. জুলকারনাইন

মোংলাবন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৩৩
মো. খোরশেদ আলম ও মনজুর ই খোদা

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন : আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৪৩
মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার ও মনজুর ই খোদা

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম : যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৫০
জাফর সাদেক চৌধুরী

নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার : ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ১৬৩
মো. ওয়াহিদ আলম, জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, কুমার বিশ্বজিত দাশ মোহাম্মদ নূরে আলম, নাহিদ শারমীন ও ফাতেমা আফরোজ

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল : পাসপোর্ট সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৭৬
মো. আলী হোসেন

তৃতীয় অধ্যায়
বেসরকারি খাতের সুশাসন

বাংলাদেশের স্বর্ণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি : চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ১৯১
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, মো. রেযাউল করিম ও অমিত সরকার

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ ২১১
নাজমুল হুদা মিনা

গবেষক পরিচিতি ২২২

মুখবন্ধ

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে সহায়তা করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক আটটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের নবম সংকলন ২০১৯ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলন তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বেসরকারি খাতের সুশাসন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের ওপর পর্যালোচনাভিত্তিক টিআইবির নিয়মিত গবেষণা পার্লামেন্ট ওয়াচের সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এ সময়ে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে কোনো কোনো নির্দেশকে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোরাম-সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়া, আইন প্রণয়নে সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালে সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয়, শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি, বিরোধী সদস্যদের মতামত উত্থাপন ও তাঁদের প্রস্তাব বিবেচনা না করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। এ ছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটির সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংসদীয় কোনো কোনো কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি-সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও আদালতব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে বলে উঠে এসেছে।

অধস্তন আদালতের ওপর একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অধস্তন আদালতব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ও কার্যকর জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হওয়া ও মামলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। বেশির ভাগ দলের ইশতেহারে দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার দেখা গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুর্নীতির আরও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ দলের অনেক অঙ্গীকার থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো কোনো অঙ্গীকার পূরণ করা হলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার, যেমন কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পাল নিয়োগ, 'কালো আইন' বাতিল, জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি কখনোই পূরণ করা হয়নি বলে দেখা যায়। অন্যদিকে বাক্‌স্বাধীনতা, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার মতো বিতর্কিত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে একাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ প্রবন্ধে। দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং গবেষণার আওতাভুক্ত এনজিওগুলোতে সুশাসনের কিছু ইতিবাচক চর্চা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা সুবিধা আদায় করার ফলে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এনজিওর জবাবদিহির ঘাটতি তৈরির ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশিকায় দুর্বলতা, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে যথাযথ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগে দুর্বলতা, স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের একাংশের অযাচিত প্রভাব, এনজিওগুলোর অনুদাননির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মতো প্রতিবন্ধকতা বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসন চর্চার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি করছে।

পঞ্চম প্রবন্ধে দেখা যায়, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের পারিবারিক দায় নারীর দিক থেকে ভিন্ন ধরনের একটি অভিজ্ঞতা এবং এটি নারীর ওপর ভিন্ন একধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। এ প্রবন্ধে নারী বিভিন্ন ভূমিকায় এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন বলে দেখা যায়। একদিকে নারী দুর্নীতির শিকার হিসেবে স্বামীর দুর্নীতির দায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন, দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে নারীকে ব্যবহার করে অবৈধ আয় ও সম্পদ গোপন করা হচ্ছে, আবার অন্যদিকে দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে নারী অর্জিত অবৈধ আয়ের মালিকানা অর্জন করছেন এবং দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে সার্বিকভাবে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তাকারী হিসেবে নারী ভূমিকা পালন করছেন।

বিভিন্ন সেবা খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে সেবা খাতে দুর্নীতি নিয়ে টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭-এর ফলাফলের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আলোচনা করা হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, ২০১৭ সালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০১৫ সালের খানা জরিপে প্রাপ্ত হারের (৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ) প্রায় সমান। ২০১৭ সালে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে, যা ২০১৫ সালের তুলনায় কম হলেও ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা। জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৬৮৮ দশমিক ৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জিডিপির শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো যেসব খাতে সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক দুর্নীতির শিকার হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭২ দশমিক ৫ শতাংশ), পাসপোর্ট (৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ), বিআরটিএ (৬৫ দশমিক ৪ শতাংশ), বিচারিক সেবা (৬০ দশমিক ৫ শতাংশ), ভূমিসেবা (৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ), শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (৪২ দশমিক ৯ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য (৪২ দশমিক ৫ শতাংশ)। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার মূল কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৮৯ শতাংশ খানা, যা ২০১৫ সালে ছিল ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ। এর মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা প্রকট, যেখানে অতি মুনাফাকেন্দ্রিক কমিশনভিত্তিক সেবাব্যবস্থা এবং গুণগত মানের চেয়ে সংখ্যাগত বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও এখানে সরকারের যথাযথ মনোযোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন হয়নি। নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন না করা, পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে

সমন্বয়ের ঘাটতিও বিদ্যমান। বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি ও অনিয়মের প্রবণতা এ প্রবন্ধে উঠে এসেছে।

পরের দুটি প্রবন্ধে মোংলাবন্দর ও কাস্টম হাউস এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উভয় বন্দর ও শুল্ক প্রতিষ্ঠানে পণ্য ছাড় ও শুল্কায়নের প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন হয়। উভয় বন্দরেই পণ্য ছাড় ও শুল্কায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, অকার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ এবং শ্রমিক, দালাল ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের একাংশের যোগসাজশে গড়ে ওঠা অসৎ চক্র, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ঘাটতি এবং পুরোপুরি ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এসব প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটছে বলে আলোচনায় দেখা যায়। উভয় বন্দর ও কাস্টম হাউসের সেবা প্রদানে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়সহ রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটছে। সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো উপস্থিত থাকলেও তার কার্যকারিতায় ঘাটতি রয়েছে।

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, সেবাসংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতার ঘাটতি এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ঘাটতির ফলে বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীরা সেবাপ্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপে হয়রানির শিকার হন, অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া নিষিদ্ধ পণ্য আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টিসহ শুল্ক ফাঁকির ঘটনা ঘটে।

নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এর পরের প্রবন্ধে তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা যায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে সরকারি, বাণিজ্যিক ও তথ্যসেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত ও সহজলভ্য করতে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। কেন্দ্র ও জেলা পর্যায় থেকে প্রদানকৃত সরকারি বিভিন্ন সেবা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রদান শুরু করায় সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়, সেবার জন্য গমনসংখ্যা ও সময় হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সেবার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। তবে ইউডিসি পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে নির্দেশনা নীতিমালায় এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। নষ্ট বা অচল কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি মেরামত বা নতুনভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। ইউডিসির সেবার ধরন ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণার অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। ইউডিসির কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া ইন্টারনেট ও সার্ভারের ধীরগতিসহ বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততাও রয়েছে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশন না হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সেবা সমন্বিতভাবে

প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়নি। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের একাংশের মধ্যে ইউডিসির বিকাশ ও টেশসইকরণে অনুঘটকের ভূমিকা পালনে দায়িত্ববোধের ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উদ্যোক্তার মধ্যে 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব' সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি বিদ্যমান।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে বরিশালের বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যালয়ের সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় বরিশাল পাসপোর্ট কার্যালয়ে সেবাগ্রহীতাদের একটি বড় অংশ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা, পুলিশি তদন্তে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে দালালের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া বরিশাল পাসপোর্ট কার্যালয়ে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে, যা এ কার্যালয়ের সুষ্ঠু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বেসরকারি খাতের সুশাসন নিয়ে দুটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্বর্ণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বর্ণ খাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনাসহ বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং স্বর্ণ খাতকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষণায় দেখা যায় একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানি-নীতির অনুপস্থিতিতে এবং সার্বিকভাবে দেশের স্বর্ণ খাতের ওপর সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাবে এটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ খাতের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার ঘাটতি ও প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণে দেশে অবৈধ পথে স্বর্ণের অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর অলংকার ব্যবসায়ীদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান যাচাই, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বর্ণ শিল্পী বা শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে রপ্তানি শিল্প হিসেবে স্বর্ণ খাতের বিকাশ হয়নি। এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর টিআইবি প্রণীত খসড়া জাতীয় স্বর্ণ নীতিমালা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

শেষ প্রবন্ধটি তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে টিআইবির ধারাবাহিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে রচিত। দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী পাঁচ বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিক পক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। রিমেডিয়েশন কো-

অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। আবার আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে, এই প্রত্যাশা করছি। টিআইবির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধগুলোতে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে, টিআইবির এই প্রত্যাশা। এই সংকলনের উৎকর্ষের জন্য পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান

পার্লামেন্ট ওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ : চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন*

মোরশেদা আক্তার, নিহার রঞ্জন রায় ও অমিত সরকার

প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং সেই সঙ্গে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বপরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি। জনপ্রতিনিধিরা প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ, বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন বক্তব্য, আইন প্রণয়ন এবং কমিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারেন।

বাংলাদেশে সংসদ মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে স্বীকৃত। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এদের উদ্দেশ্য দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ-সংশ্লিষ্ট দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশি দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহি, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর পন্থা সুপারিশ করে থাকে। সরকারের জবাবদিহি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি

---

* ২০১৮ সালের ১৭ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এ প্রতিবেদন এই সিরিজের ১৪তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর চতুর্থ প্রতিবেদন।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ;
- সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা;
- আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ;
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচনা পর্যবেক্ষণ;
- সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ করা।

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক ও গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ। সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম-সংকট ও সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআইট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ-সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত বিষয়, পয়েন্ট অব অর্ডার, সংসদীয় কমিটি-সংক্রান্ত তথ্য, সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও বক্তব্যে ভাষার ব্যবহারসংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ

সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই গবেষণায় সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় চর্চা ও মানদণ্ড, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় উল্লিখিত জনগণের তথ্য অভিগম্যতা, আইপিইউর লক্ষ্য ও সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মেলনে প্রকাশিত সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্রের আলোকে বিভিন্ন দেশের সংসদ-সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধিবেশনের কার্যকাল

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস ছিল ৭৬ দিন। ষষ্ঠদশ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। বছরের শুরুতে চতুর্দশতম অধিবেশনটিতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় : দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত ৭৬ কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ২৬০ ঘণ্টা ৮ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট।

চিত্র ১ : বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)[১]

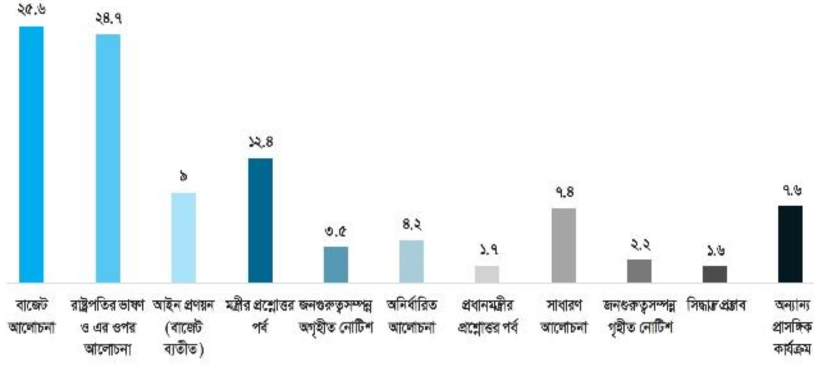

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের মোট ৭৬ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ৩০৯ জন, যা মোট সদস্যের ৮৮ শতাংশ। দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩০ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[২] সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫০ শতাংশ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে। একজন সরকারি দলের সদস্য[৩] সংসদে মাত্র দুদিন উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৭৬ শতাংশ সদস্য অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ২৮ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ২৬ শতাংশ সদস্য এবং ১৮ শতাংশ মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রীদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি ছিল ২৫ শতাংশের কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। সংসদনেতা ৭৮ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা ৪৬ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। সংসদনেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় এখনো উল্লেখযোগ্যহারে কম। দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সরকারদলীয় একজন সদস্য[৪] এবং প্রধান বিরোধীদলীয় একজন সদস্য[৫] সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান। ২০১৭ সালে এই দুই সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনপত্রগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। পরে এই অনুমতি-সংক্রান্ত নথিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কারা মহাপরিদর্শককে প্রেরণ করা হয়।[৬]

ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন : চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধীদলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন করেননি।

কোরাম-সংকট : চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট ৩৮ ঘণ্টা ৩ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয় যা পাঁচটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট কার্যকালের (২৯৮ ঘণ্টা ১১ মিনিট) ১৩ শতাংশ। পাঁচটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩০ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা খরচ হয়।[৭] এ হিসাবে প্রতি

কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৯ লাখ ১০ হাজার ৫৮০ টাকা এবং চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাঁচটি অধিবেশনে কোরাম-সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের (৩৮ ঘণ্টা ৩ মিনিট) অর্থমূল্য ৩৭ কোটি ৩৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা। নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, অধিবেশনপ্রতি এবং কার্যদিবস প্রতি গড় কোরাম-সংকট প্রায় একই রকম। উল্লেখ্য, নবম সংসদে কোরাম-সংকট ছিল ৩২ মিনিট, যা দশম সংসদে ছিল ৩০ মিনিট।

আইন প্রণয়ন

এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট ২৪টি সরকারি বিল পাস হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৯ শতাংশ। বিলের ওপর আপত্তি, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারি সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় মোট ২৬ জন সদস্য ৩৩ শতাংশ সময় আলোচনা করেন। এই সময়ের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ সময় অংশগ্রহণ করেন। বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সব প্রস্তাব নাকচ হওয়ার কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের চর্চা এখনো সীমিত। বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত না হওয়ার বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কয়েকজন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনের ওপর আলোচনায় মোট সদস্যদের মাত্র ৭ শতাংশ অংশগ্রহণ করেছেন। বিল উত্থাপন, বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা, মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩৫ মিনিট।

বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৬ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়, যা মোট সময়ের ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ। মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় ১৯০ জন সদস্য প্রায় ৭৭ শতাংশ (৫০ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট), ১৪ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৬ শতাংশ (৪ ঘণ্টা ২১ মিনিট) এবং ৪৩ জন সদস্য মঞ্জুরি দাবি উত্থাপন ও এ-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৬ শতাংশ সময় (৪ ঘণ্টা ২৭ মিনিট) অংশগ্রহণ করেন। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও সহমত পোষণ করে বলতে দেখা যায়, 'অর্থ পাচার যেটা হয়, সেটা বেআইনি, সেটা রুদ্ধ করার সুযোগ নেই। তবে যেটা আমরা করতে পারি তা হচ্ছে, পাচারের সুযোগ কমানো। আমরা টাকা পাচারের সুযোগ কমানো বা কালোটাকা সৃষ্টির সুযোগ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারি। কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী মাসের মধ্যে দেখবেন কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তবে নিয়মিতভাবে কালোটাকা সাদা করার আইন দেশে আছে। সে ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে।[৮]' সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয়-সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি কার্যক্রম

প্রশ্নোত্তর পর্ব : প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ২০ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ১৩ জন সরকারি দলের, ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচন (৩৭ শতাংশ) সংক্রান্ত। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদনেতার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার অর্জন নিয়ে সদস্যদের আলোচনা।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৯টি কার্যদিবসে মোট ১৫৩ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১২ দশমিক ৪ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (১৬টি) মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা বা সেবা কার্যক্রম), পরিকল্পনা প্রস্তাব বা অবকাঠামো স্থাপন নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশি (৩৮ শতাংশ)। এ ছাড়া সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়মনীতি, পদক্ষেপ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগের প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১) : এই পর্বে ১৩টি নোটিশ উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১০টি, স্থগিত করা হয় ৩টি ও ৯টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। আলোচিত ১০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৯টিই উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। পঞ্চদশ অধিবেশনে 'গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা'র প্রস্তাবটি সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা বা সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশি (৮০ শতাংশ)। এ ছাড়া নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি-সংক্রান্ত প্রস্তাবও রয়েছে।

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ (বিধি ৭১) : বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ৭৬৭টি নোটিশের মধ্যে ৬০টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই গৃহীত নোটিশের মধ্যে ২৭টি নোটিশ সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ (৭টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। যেসব নোটিশ গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ২৩৭টি নোটিশের ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে

বেশি (৩৩টি)। উল্লেখ্য, এই বিধিতে নোটিশ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

অনির্ধারিত আলোচনা : এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪ দশমিক ২ ভাগ সময় ব্যয়িত হয় এবং মোট ৫৪ জন সদস্য এই পর্বে বক্তব্য দেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়গুলোর ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি (৪১ শতাংশ) আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা সেবা কার্যক্রম ও বাস্তবায়নে অনিয়ম, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা), বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা, সংসদীয় আচরণ, সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকারপ্রধানের জনপ্রিয়তা এবং প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ আলোচনা : সাধারণ আলোচনায় মোট ৯২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় ৭ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যয়িত হয়। জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সব আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতোই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশসহ অন্যান্য আলোচনাপর্বে সরকারি দলের সদস্যদের বেশি সময়ব্যাপী অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য বেশি সময় অংশগ্রহণ এবং সরকারি দলের অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্য। মোট ৩০৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার ব্যতীত মোট ৩৬ জন সদস্য (প্রায় ১০ শতাংশ) কোনো পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশি সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনাপর্বে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম : এই পাঁচটি অধিবেশন চলাকালীন ৪৬টি কমিটি মোট ৯০০টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৫২টি সভা করে। উল্লেখ্য, বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি সভা করেছে ৪২টি কমিটি, চারটি কমিটি কোনো সভা করেনি।

কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের ও দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৯] হলফনামার তথ্য

অনুযায়ী ৮টি কমিটিতে[১০] সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায়, যা কার্যপ্রণালি বিধির লঙ্ঘন।

এই ৫টি অধিবেশন চলাকালীন মোট ১৬টি কমিটির ১৭টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০টি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। ১১টি কমিটির তথ্য অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৬ শতাংশ। উল্লেখ্য ৫টি কমিটির প্রতিবেদনে সদস্যের উপস্থিতির তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কমিটিগুলোর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৪১ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ সুপারিশ ছিল তদন্ত বা সাব-কমিটি গঠন; তথ্য বা প্রতিবেদন উপস্থাপন প্রকাশনা বা সরবরাহ বা প্রচার-সম্পর্কিত। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ-সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- বিআরটিসির দুর্নীতি দূরীকরণে ও প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে ৪ সদস্যবিশিষ্ট সাবকমিটি গঠন ও ২ মাসের মধ্যে রিপোর্ট উপস্থাপন।[১১]
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না, তা তদন্ত করতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন।[১২]
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়া।[১৩]
- সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের দুর্নীতি, অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ।[১৪]
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ।[১৫]
- খাদ্যগুদামে চুরি, আত্মসাৎ ও দুর্নীতি রোধকল্পে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা।[১৬]
- বই ছাপানো-সংক্রান্ত অনিয়ম, দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।[১৭]
- বিটিএমসির অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় আর কে মিশন রোডে অবৈধ ভবন নির্মাণ ও অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে অনুমিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য বিটিএমসির চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ।[১৮]

উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব

এই আলোচনাপর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্যজুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার

(কটূক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে এবং সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন। সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত ছিল। এ ছাড়া সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে সমালোচনা করতেও দেখা যায়।

সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা

কার্যপ্রণালি বিধি ২৭০-এর ৬ উপবিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন আলোচনাপর্বে সদস্যরা অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে মোট সময়ের ৫ শতাংশ ব্যয় করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও এ ধরনের আলোচনা বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষ দল, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ১৯৫ বার অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। এ ছাড়া সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (বিশ্বব্যাংকসহ) ২৩ বার এবং স্বীয় দলের সমালোচনায় একবার অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া বিধি অনুযায়ী (কার্যপ্রণালি বিধি ২৬৭-এর উপবিধি ২, ৪, ৮) অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের একাংশের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তার নিকটবর্তী আসনের সদস্য কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলার মতো ঘটনা দেখা যায়।

জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে ৪৬ শতাংশ নারী উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ২৭ শতাংশ। নারী সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে। একজন সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য এই পাঁচটি অধিবেশনের সব কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।[১] প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরপর্বে দুজন (সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২৯ জন (সংরক্ষিত আসনের ২৪ জন) নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন মাত্র দুজন নারী সদস্য (প্রধান বিরোধী দলের সংরক্ষিত আসন)। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ৬ জন নারী সদস্য ৬টি নোটিশের ওপর এবং ৭১-ক বিধিতে ১৬ জন নারী সদস্য ৩৫টি

নোটিশের ওপর আলোচনা করেন। এ ছাড়া ৪১ জন নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৪৯ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য দেন। আইন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম। নারী সদস্যদের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যদের তুলনায় বেশি হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটিতে কোনো নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকার বলে সভাপতি)। সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ের।

বিভিন্ন আলোচনাপর্বে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচিত বিষয় : সপ্তদশ অধিবেশনকে কেস হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন পর্বে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে, জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পর্বে এ-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়নি। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ পর্বে নারীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন-সম্পর্কিত ৪টি নোটিশ উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে একটি নোটিশ গৃহীত হয়। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল ২৬টি, যা মোট প্রশ্নের ১০ শতাংশ।

সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি, অর্থাৎ সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান এবং দশম সংসদের প্রায় চার বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের আত্মপরিচয়-সংকটের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারদলীয় সদস্যদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া, সরকারি দল কর্তৃক প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করতে দেখা যায়। সার্বিকভাবে তারা সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার আগের

মতোই কম। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকাণ্ড, জঙ্গি অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কোরাম-সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে সদস্যদের, বিশেষ করে সরকারদলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনো বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশি হলেও আলোচনায় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম।

আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। তা ছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটির সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা না থাকা ও সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংসদীয় কার্যক্রম-সম্পর্কিত, কমিটি-সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা, অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে প্রধান বিরোধী দলের তথা সংসদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনো এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এ ছাড়া বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াকআউট না করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদীয় কার্যক্রমে, যেমন বাজেটবিষয়ক সমালোচনার ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশের সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয়, 'সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।'

সারণি ১ : অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১-২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪-২০১৭)
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫ শতাংশ	৭৭ শতাংশ	৮৮ শতাংশ
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের হার	১০ শতাংশ	৯ দশমিক ৫ শতাংশ	৯ শতাংশ
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩৪ মিনিট	২৮ মিনিট	৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকট	২৫ মিনিট	৩২ মিনিট	৩০ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নন	২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	মাত্র একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
বিরোধী দলে ওয়াকআউট	৭ বার	১৪ বার	ওয়াকআউট করেননি
প্রধান বিরোধী দল বা জোটের সংসদ বর্জন	৮৩ শতাংশ কার্যদিবস	৮৩ শতাংশ কার্যদিবস	বর্জন করেনি

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. নবম সংসদে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে আস্থা বা অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোট দেওয়ার বিধান থাকবে।

৪. আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাব সরকারি দলকে বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তি সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলগুলো সংসদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

৯. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত (প্রস্তাব–ছয় মাস অন্তত ১টি) প্রকাশ করতে হবে।

১০. সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত কমিটিসহ সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।

১১. কমিটির সুপারিশগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বার্ষিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১৩. সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা, এসব তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. সংরক্ষিত আসনসহ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] সংসদ টিভিতে প্রচারিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

[২] জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[৩] বাংলাদেশ আসন : ১০২ (খুলনা-৪)

[৪] বাংলাদেশ আসন : ১৩২ (টাঙ্গাইল-৩)

[৫] বাংলাদেশ আসন : ১৫২ (ময়মনসিংহ-৭)

[৬] প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৭।

[৭] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত এবং সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা-সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়সংশ্লিষ্ট অর্থের সঙ্গে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের

ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৯৪.০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিল ৫ দশমিক ৩৫ কোটি টাকা (২০১৬-১৭), সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ৭ দশমিক ৮২ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁদা ৯০ লাখ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (কোরাম-সংকটসহ)। এই হিসাবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থমূল্য দাঁড়ায় ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

[৮] 'ব্যাংক লুটেরাদের বিচার দাবি জাতীয় সংসদে', *যুগান্তর*, ৭ জুন ২০১৭।

[৯] ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতা : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, টিআইবি, ২০১৫।

[১০] অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি।

[১১] সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি-প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ৮৮।

[১২] বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট–দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ১৯৮।

[১৩] বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট–দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ২৫০।

[১৪] অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি–প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ৬৮।

[১৫] খাদ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ৮৬।

[১৬] খাদ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ৭১।

[১৭] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃ. ১৮২।

[১৮] বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃ. ১৪৯ (৫ম বৈঠক)।

[১৯] বাংলাদেশ আসন : ৩২৩ (সংরক্ষিত আসন-২৩)।

বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থা
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

শাম্মী লায়লা ইসলাম, নাজমুল হুদা মিনা ও নাহিদ শারমীন

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের অন্যতম। বাংলাদেশের অধস্তন আদালত বিচার বিভাগের একটি অন্যতম অংশ। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার–সর্বোপরি আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।[১] বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪ থেকে ১১৭ পর্যন্ত বিচার বিভাগ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট, সব অধস্তন আদালত এবং বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। বাংলাদেশের প্রতিটি আদালতের বিচারিক ক্ষমতা সংবিধান অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক পাসকৃত আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।[২] একটি দেশের বিচার বিভাগ বলতে আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানকারী বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালসহ সব ধরনের আদালতকে বোঝায়। প্রচলিত আইন ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিচারপ্রার্থী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এই আদালতগুলোর লক্ষ্য। যখন স্বাভাবিক জীবনধারার মধ্য থেকে মানুষের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয় বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন সেই অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা অপরিহার্য। সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং তৎক্রমনিম্নভাবে জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি আদালত রয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ মামলাগুলোর জন্য রয়েছে বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় অধস্তন আদালত বিচারিক সেবা প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সাধারণত বেশির ভাগ মামলাই প্রাথমিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে এই পর্যায়ের নিম্নতম ও এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে শুরু হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (অনুচ্ছেদ ১১৪-১১৬ক) অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও

* ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

শৃঙ্খলা, দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ ও মাজদার হোসেন মামলার[৩] রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসিকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ কার্যকর হয়। স্থানীয় পর্যায়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিজেএম), মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিএমএম), বিভিন্ন বিশেষ আদালত (যেমন স্পেশাল জজ আদালত, বন আদালত ইত্যাদি) ও ট্রাইব্যুনাল (যেমন নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি) এই অধস্তন আদালতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সব জেলা ও কয়েকটি মহানগরে এই আদালতগুলো অবস্থিত। এ ছাড়া দেশের কয়েকটি উপজেলায় কিছু চৌকি আদালত[৪] রয়েছে। দেশে বিচারাধীন মোট মামলার বেশির ভাগই (৮৬ শতাংশ) দেশের এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে।[৫] ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত দেশের সব আদালতে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৫টি। এই আদালতগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীসহ আপামর বিচারপ্রার্থী জনগণ প্রতিদিন আসে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশায়।

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সুশাসন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে সম্যক বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর অনুকূলে আর্থিক ও আইনি সমর্থন দানের কথা বলা হয়েছে।[৬] এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রেও রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সমান বিচারপ্রাপ্তির অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সব পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের আদালতগুলোর উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও জেলা জজ আদালত ভবন নির্মাণ ও ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে প্রকল্প গ্রহণ, কেস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন, সব জেলার আদালতের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি, আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রবর্তন ও প্রসার, তিন বছরমেয়াদি ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ, বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থলত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু, বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালু, দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান, জাতীয় হেল্পলাইন '১৬৪৩০' স্থাপন, আদালত প্রাঙ্গণে আইনগত সহায়তার তথ্যসংবলিত বিলবোর্ড স্থাপন, কয়েকটি জেলার আদালত ভবনে মাতৃদুগ্ধ

পান কক্ষের ব্যবস্থা, আদালত কক্ষের বাইরে বসার ব্যবস্থা, কক্ষ নির্দেশিকা টাঙানো, মামলার তালিকা টাঙানো, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ ধরনের নানা সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি ও নানা সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ের প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যেও[৭] বিচারব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের (২০১০, ২০১২, ২০১৫) সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপেও তথ্যদাতারা বিচারিক সেবা খাতকে অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএনডিপি পরিচালিত জেলা আদালতের ওপর একটি খানা জরিপে দেখা যায়, ৩১ শতাংশ জনগণ মনে করেন বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি বিদ্যমান। এ ছাড়া ১১ শতাংশ জনগণ বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৮] আরও দেখা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের (সহিংসতার শিকার) জন্য আদালতে বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন নিরাপত্তা, বসার স্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা লক্ষ করা যায়। গত তিন বছরে বিচারব্যবস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞদের ২১ শতাংশ মনে করেন, গত তিন বছরে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।[৯]

দেশের আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে অধস্তন আদালতের বিচারিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরি। টিআইবি বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা (দ্রুত বিচার আদালত, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও জাতীয় খানা জরিপ) এবং তার আলোকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবং অধস্তন আদালতব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা;
- বাংলাদেশের অধস্তন আদালতব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার চর্চার বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;

- অধস্তন আদালতব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা।

এই গবেষণায় অধস্তন আদালতব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত, যেমন জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও কিছু বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি এবং অধস্তন আদালতব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার) আলোকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েকটি জেলা ও মহানগর এলাকায় অবস্থিত আদালতব্যবস্থার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সক্ষমতার অধীনে আদালতগুলোর অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বরাদ্দ; স্বচ্ছতার অধীনে তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা; জবাবদিহির অধীনে বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ, আইনজীবীদের জবাবদিহি ও তদারকি, আদালতের সার্বিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং শুদ্ধাচারের অধীনে আদালতে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি, বিদ্যমান দুর্নীতি-অনিয়মের ধরন ও কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ অধস্তন আদালতব্যবস্থার সব অংশীজন তথা সব বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে অধস্তন আদালতব্যবস্থার বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেমন সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার মধ্য থেকে বিভাগীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ১৮টি জেলা বা এলাকার অধস্তন আদালতের ওপর আদালতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে অধস্তন আদালতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন; যেমন অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা, আইনজীবী (রাষ্ট্রপক্ষীয় আইনজীবীসহ), জেলা বার সমিতির সভাপতি, আইনজীবীর সহকারী বা মহুরি, বিচারপ্রার্থী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কর্মকর্তা, জেলা আইনগত সহায়তা সংস্থার

কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট ৪৩৭ জন তথ্যদাতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন[১০], অধস্তন আদালত থেকে সংগৃহীত তথ্য, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, সংবাদ ও প্রবন্ধ।

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

অধস্তন আদালতব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আইনি সীমাবদ্ধতা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদগুলোতে একদিকে অধস্তনসহ সব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে অধস্তন আদালতের ওপর একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান থাকায় দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিরাজ করছে। এ ছাড়া বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশ হয়নি। এ ছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ (পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলি)-এর কারণে কিছু ক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ার পর পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩-এ বলা হয়েছে, কোনো সদস্য কোনো উচ্চতর পদে ও বেতন স্কেলে পদোন্নতি পেলে বা পাওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এই শর্ত আরোপ করায় বিচারকরা পরবর্তী পদে পদোন্নতি পাওয়ার পরও পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের অংশগ্রহণের বিধান কোনো আইনে সুস্পষ্ট নেই। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আইনগুলোতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ না করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হতে পারে।

দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ : অধস্তন আদালতের ওপর একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অধস্তন আদালতব্যবস্থায় কার্যসম্পাদনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। অধস্তন আদালতসংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং সময়ক্ষেপণ হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ কারণে কিছু ক্ষেত্রে বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া দ্বৈত

প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ফলে কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া দেখা যায় যে মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবে সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দেওয়ার পরও মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করে এবং এতে করেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রেষণে কর্মরত বিচারিক কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে যাওয়ার একটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।[১১] অন্যদিকে দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রকৃত অর্থে কার্যকরভাবে বিচার বিভাগ পৃথককরণে কিছু চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে বলে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, পৃথক্‌করণের আগে বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়গুলো সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে ছিল এবং বর্তমানে তা আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে; অর্থাৎ সরকারের অধীনেই রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা রয়ে গেছে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।[১২]

অবকাঠামোগত ঘাটতি : গবেষণার আওতাধীন অধস্তন আদালতগুলোর অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ এলাকায় দেখা গেছে যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণকাজ এখনো শুরু হয়নি বা শুরু হলেও এখনো নির্মাণকাজ শেষ হয়নি বা শেষ হলেও এখনো সে ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়নি। এ ছাড়া সময় ও বিষয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন আদালত (যেমন ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালত ইত্যাদি) সৃষ্টি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসব আদালতের জন্য পৃথক আবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি। গবেষণার আওতাধীন ১৮টি এলাকার মধ্যে ৭টিতে নতুন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে, ৬টিতে এখনো শুরু হয়নি, ৫টির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং সেগুলোতে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পৃথক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন না থাকায় এই আদালতগুলোকে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভবনের কক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই বিচারিক কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী নয়। এ ছাড়া বিদ্যমান আদালত ভবনগুলোর (নতুন ভবন ব্যতীত) বিভিন্ন অংশ ভাঙা বা স্যাঁতসেঁতে, যেখানে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যের ঘাটতি রয়েছে।

আদালতগুলোতে কক্ষ-সংকট রয়েছে এবং এ কারণে অনেক আদালতেই বিচারকের সংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজলাস কক্ষ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুজন বিচারককে একটি এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করে বিচারকাজ পরিচালনা করতে হয়।[১৩] এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করার ফলে একজন বিচারক তার পুরো কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ সময় বিচারকাজে ব্যয় করতে পারেন না। কারণ তাকে পরবর্তী বিচারকের জন্য এজলাস ছেড়ে দিতে হয়। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে মামলার বা সাক্ষীর শুনানি করা সম্ভব হয় না এবং ওই মামলার একটি পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। এর ফলে মামলাটি দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে যায়। এ ছাড়া বিচারপ্রার্থীর

ওই দিনের যাতায়াত, খাওয়ার খরচ, উকিল খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ হলেও বিচারপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ পড়েই থাকে। এতে করে মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। একইভাবে বিভিন্ন আদালতের রেকর্ডরুম, মালখানায়ও স্থান-সংকট রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভবন পুরোনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং সেগুলোতে উইপোকার উপদ্রব রয়েছে। ফলে আসবাব ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আদালতগুলোতে দায়িত্বরত পুলিশের অবস্থান ও কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এ ছাড়া আদালত প্রাঙ্গণে বিচারপ্রার্থীদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা রয়েছে। নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা (লিফটের ব্যবস্থা না থাকা বা থাকলেও সচল না থাকা) নেই। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা রয়েছে।

আর্থিক বরাদ্দের ঘাটতি : অধস্তন আদালতগুলোতে বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। অধস্তন আদালত থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা নেই। মন্ত্রণালয় থেকে বার্ষিক যে বাজেট পাঠানো হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং প্রায়ই কিছু খাতভিত্তিক (যেমন লজিস্টিকস, যানবাহন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বাজেট শেষ হয়ে যাওয়ায় আদালতগুলোকে মন্ত্রণালয়ের কাছে কন্টিনজেন্সি বাজেট চাইতে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ভাতা (যেমন সমন জারির যাতায়াত ভাতা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ভাতা) বর্তমান সময়ের বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

লজিস্টিকস ঘাটতি : অধস্তন আদালতে অবকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও (আসবাব, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফরম, যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ হওয়ার পরও আদালতগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাব নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে আদালতে বিদ্যমান আসবাব জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপযোগী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। আদালতগুলোতে কম্পিউটারের স্বল্পতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটার পুরোনো হওয়ার কারণে বিকল ও ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে যাওয়া এবং এগুলো মেরামতে সময় লাগে। ফলে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ ছাড়া প্রিন্টার ও প্রিন্টারের কালি বা টোনারেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে রায় লেখার জন্য ব্যবহৃত সাদা কাগজ ও নীল কাগজের অপ্রতুলতা রয়েছে।[১৪] এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আদালতে ইন্টারনেট-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে।

জনবল ঘাটতি : দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বিপুলসংখ্যক মামলা চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিন এই মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই বিপুলসংখ্যক মামলার কর্মভার পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে অধস্তন আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারকের ঘাটতি রয়েছে এবং কাজের চাপের তুলনায় অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীর সংখ্যাও অপ্রতুল। মামলার সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, জনবলের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। আবার সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালত সৃষ্টি করা

হলেও সে আদালতগুলোর (ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি) জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশে ১০ লাখ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছেন।[১৫] গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গবেষণার আওতাভুক্ত জেলাগুলোর ৬২১টি আদালতে ১১৪ জন বিচারকের সাময়িক ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো আদালতের বিচারক বদলি হয়ে গেছেন কিংবা অবসর গ্রহণের কারণে চলে গেছেন কিন্তু ওই পদগুলোতে সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিচারকদের পদায়ন না করায় পদগুলো সাময়িকভাবে শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া আরও দেখা যায়, কিছু আদালতের বিচারকরা প্রশিক্ষণ ও ছুটিতে (মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি) থাকায় ওই পদগুলোও সাময়িকভাবে খালি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অন্য একজন বিচারককে ভারপ্রাপ্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে সেসব বিচারককে একাধিক আদালতের কার্যসম্পাদন করতে হয় এবং নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের সব কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে।

গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলোর সব কটিতেই সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে এবং আদালতগুলোতে ৫৭৯ জন সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কম রয়েছে। বিভিন্ন পদে কর্মচারী (যেমন স্ট্যানোগ্রাফার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, জারিকারক ইত্যাদি) সংখ্যা কম বা পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া আদালতগুলোতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। জনবল কম থাকায় সব পর্যায়ে কাজের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং কিছু ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে ধীরগতি আসে। কাজের চাপ সামলানোর জন্য কর্মচারী কর্তৃক অনানুষ্ঠানিকভাবে উমেদারদের কাজে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি : বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়; বিশেষ করে বিশেষায়িত আইনের (যেমন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়াল, সাইবার আইন ইত্যাদি) ওপর প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের বনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেতে এক বছরের অধিক সময় লেগে যায়। অন্যদিকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে কখনো কখনো এক ব্যক্তি এক বছরে একাধিক প্রশিক্ষণ পান। আবার অনেকে দীর্ঘদিন কোনো প্রশিক্ষণই পান না। অন্যদিকে আদালতের কর্মচারীদের জন্য খুব কমসংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। স্থানীয়ভাবে কর্মচারীদের জন্য বছরে একটি কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যেখানে বিচারকরা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটিও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। একইভাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্যও খুব কমসংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আবার পিপি ও জিপিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য পর্যায়ের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের (যেমন এপিপি

বা এজিপি) জন্য প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও অনেক কম।[১৬]

বিচারক ও কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ : বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে।[১৭] এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির প্রক্রিয়ায়ও দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। একজন বিচারক বদলি হওয়ার পর ওই পদে নতুন বিচারক পদায়নেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জেলা জজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ও সঠিক সময়ে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো হয় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদবির না শোনায় বিচারকদের বদলি ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন শাস্তি হিসেবে তাৎক্ষণিক বদলি, কম নম্বর প্রদান ইত্যাদি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে বদলির জন্য প্রভাব বিস্তার বা তদবির পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, রাজনৈতিক যোগাযোগ বা প্রভাবের মাধ্যমে পছন্দনীয় স্থানে বদলি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অধস্তন আদালতে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগে তদবির, নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়োগ প্রদানের জন্য তদবির আসা এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব ও এলাকাভেদে প্রায় তিন লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো জেলায় কর্মচারী নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় কোর্ট কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের যোগসাজশের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়। কর্মচারীদের নিয়মিত বদলি হয় না। কর্মচারী বদলির ক্ষেত্রেও তদবির ও নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কিছু বিশেষ আদালত (যে আদালতে মামলা বেশি বা নিজ এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ইত্যাদি, যেখানে দুর্নীতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে) বা শাখায় (নকল বিভাগ) পদায়ন পাওয়ার জন্য কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। সার্বিকভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ কম।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে চ্যালেঞ্জ : অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয় এবং মেধা ও অভিজ্ঞতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করেও নিয়োগ প্রদান করা হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন।

আইনজীবীদের সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জ : কিছু ক্ষেত্রে যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিও আইন চর্চা করার অনুমতি পেয়ে থাকেন। আইনজীবীদের সনদপ্রাপ্তির বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে যে কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলে নিয়মবহির্ভূত অর্থের আদান-প্রদান হয়। কিছু ক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ের এবং ল কলেজ আইন শিক্ষার সনদ প্রদান করেছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন নয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে এরূপ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা আইনচর্চার সনদপ্রাপ্ত হয়ে আইন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন; যা কিছু ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে আইনচর্চায় ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে তথ্যদাতাদের অভিমত। এ ছাড়া এ বিষয়ে হাইকোর্ট কর্তৃক আইন শিক্ষা এবং আইনজীবীর সনদপ্রাপ্তিবিষয়ক নির্দেশনা রয়েছে।

অধস্তন আদালতব্যবস্থায় জবাবদিহি

তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি : কিছু ক্ষেত্রে বিচারক ও সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (আইনজীবী, সরকারি কৌঁসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটর) জবাবদিহির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো কোনো আদালতে দীর্ঘ সময় আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। আদালতের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিতে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শন করার নিয়ম আছে। কিন্তু এ ধরনের পরিদর্শন নিয়মিত বা প্রতিবছর হয় না। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের কার্যক্রম তদারকিতে চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নানা ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ না করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন নির্দেশনা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় এজলাসে না বসা, কর্মস্থল ত্যাগ করা, বৃহস্পতিবার দ্রুত কার্যালয় ত্যাগ করা ও রোববার দেরি করে আদালতে আসা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিচারকদের জন্য নির্ধারিত বিচারিক নীতিমালায়ও বিচারকদের জন্য আচরণবিধি বর্ণিত রয়েছে। বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়ম বা আচরণবিধি লঙ্ঘনেরও অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে একজন বিচারকের ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করার বিধান থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের ওপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপসহ অন্যান্য চাপ কাজ করায় কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তদারকি করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক এবং জেলা জজ বা সংশ্লিষ্ট আদালত প্রধানের ওপর ন্যস্ত। তবে সহায়ক কর্মকর্তা-কমচারীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কাজের জন্য সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অধস্তন আদালতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা (যেমন নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শনের ঘাটতি রয়েছে।

এ গবেষণায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের ফলে কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ফলপ্রসূ হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে আইনজীবীদের আচরণ পরিবীক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয়ভাবে আইনজীবী সমিতি কিছু ক্ষেত্রে তদারকি করলেও আইনজীবীদের স্বার্থ নিশ্চিতেই বেশি তৎপর থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিলের সদস্যরা আইনজীবীদের ভোটে নির্বাচিত হন এবং কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নির্বাচনের মতো রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে।

বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে অভিযোগ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আদালতগুলোতে অভিযোগ প্রদানের জন্য কোনো ধরনের অভিযোগ বাক্স বা কোনো অভিযোগ কেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছাড়া অভিযোগ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য কোনো রেজিস্টারও সংরক্ষণ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট আদালতের প্রধান বিচারকের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ প্রদান করা যায়। তবে এর জন্য নির্ধারিত কোনো ফরম নেই; হাতে লিখে এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা কোনো ধরনের অভিযোগ জানান না বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না থাকা এবং নানা শঙ্কার কারণে তারা অভিযোগ প্রদান থেকে বিরত থাকেন বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

অধস্তন আদালতব্যবস্থায় স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতার ঘাটতি : আদালতগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোনো আদালত প্রাঙ্গণেই আদালতের সেবা বা মামলা-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যসংবলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার নেই। এ ছাড়া কোনো তথ্য কীভাবে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কেও কোনো দিকনির্দেশনা নেই। গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলোতে কোনো তথ্যকেন্দ্র দেখা যায়নি। তবে কিছু এলাকার নতুন আদালত ভবনে তথ্যকেন্দ্র হিসেবে একটি অংশকে চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয়নি বা কার্যকর নয়। এ ছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত কোনো এলাকার আদালত প্রাঙ্গণ বা ভবনে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নামসংবলিত বোর্ড টাঙানো দেখা যায়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তথ্য আইনের আওতায় তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন খুব কম আসে। ফলে তথ্য প্রদানের রেজিস্টার আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে কিছু ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এ ছাড়া মামলার নথি বা রেকর্ড সংরক্ষণে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও এটুআই প্রোগ্রামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন নামক একটি ওয়েব পোর্টাল যাত্রা শুরু করেছে। এতে দেশের প্রতিটি জেলার সব আদালতের তথ্য রয়েছে। তবে এ ওয়েব

পোর্টালে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য (যেমন মামলার পরিসংখ্যান) অনুপস্থিত রয়েছে। এ ছাড়া অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি (যেমন বার্ষিক প্রতিবেদন, মামলার কার্যতালিকা) এবং কিছু তথ্য হালনাগাদকৃত অবস্থায় নেই। প্রতিবছর অধস্তন আদালতগুলোর কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হলেও সব আদালতের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অবস্থায় নেই। এ ছাড়া দেশের সব আদালতের কার্যক্রম নিয়ে অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় না।

অধস্তন আদালতব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

প্রতারণা ও জালিয়াতি : একটি মামলা পরিচালনার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারপ্রার্থীরা নানা ধরনের ব্যক্তিদের (দালাল, আইনজীবী, মুহুরি, আদালতের কর্মচারী প্রভৃতি) দ্বারা প্রতারাণার শিকার হচ্ছেন। আদালত প্রাঙ্গণে একশ্রেণির দালালের আনাগোনা দেখা যায় এবং আইনজীবীদের কাছে যাওয়ার আগেই বিচারপ্রার্থীরা দালালদের খপ্পরে পড়েন এবং প্রতারিত হন। আদালতে মামলাসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফি বা খরচের বাইরেও সংশ্লিষ্ট অনেককে অর্থ প্রদান করতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অর্থ আইনজীবী বা তাদের মুহুরির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সে অর্থ আইনজীবী বা মুহুরিরা বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকেই নিয়ে নেন। আইনজীবীদের অনেকে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রকৃতভাবে যে অর্থ খরচ হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন হয়তো যে কাজ ৪০০ টাকায় হয়ে যাবে, ওই কাজের জন্য ১ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। কিছু আইনজীবী ও আইনজীবীর সহকারীরা অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার জন্য বিচারপ্রার্থীদের মামলার শুনানির তারিখ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেন বা ফলস ডেট দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

> "তিনি আমার থেকে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে জামিন করাবেন বলে; কিন্তু আমার বিবাদীপক্ষ থেকে টাকা খেয়ে আমার পক্ষে কথা বলেন নাই। সে কারণে আমাকে জেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ কারণে আইনজীবী পরিবর্তন করেছি। দ্বিতীয় আইনজীবী নিয়োগের সময় তার সঙ্গে চুক্তি হয় যে আমাদের জামিন করিয়ে দেবেন। তিনি আমাদের জামিন করিয়ে দিয়েছেন।"
>
> *– একজন তথ্যদাতা*

এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীরা বিচারক তার পরিচিত বা বিচারকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে এবং রায় ম্যানেজ করে দেওয়া যাবে বা পক্ষে করে দেওয়া যাবে–এসব বলে বিচারপ্রার্থীদের প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে প্রতারিত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, কিছু ক্ষেত্রে মামলার দুই পক্ষের আইনজীবীরা টাকার বিনিময়ে সমঝোতা বা যোগসাজশ করে ফেলেন বা এক পক্ষের আইনজীবী অন্য পক্ষের সঙ্গে আঁতাত

করেন, যা বিচারপ্রার্থী জানতে পারেন না। ফলে আইনজীবী পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন এবং মামলা পরিচালনায় যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন না। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও এমন অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মামলার কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন আদেশ বা রায় পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা : মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই এজলাসে থাকার কথা থাকলেও অনেক বিচারক সেই পরিমাণ সময় এজলাসে দেন না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক এলাকার আদালতের কার্যক্রম অনেক দেরিতে শুরু হয়। ফলে সেখানে বিচারের জন্য কর্মঘণ্টা কমে যায়।

মামলাসংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের একাংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। যেমন সমন জারি হওয়া মামলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর দায়িত্বে থাকে সমন জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার। কিন্তু এই জারিকারকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সমনগুলো জারি করেন না; বরং এ মর্মে তারা অর্থ দাবি করেন। আবার ব্যবসায়িক (মামলা শেষ হয়ে গেলে ওই মামলা থেকে তার আয় বন্ধ হয়ে যাবে) মানসিকতা থেকে কিছু আইনজীবী মামলা শেষ করতে আগ্রহী হন না, মামলার প্রতি গুরুত্ব দেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করেন।

কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেন না। আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদের মামলা জেতার সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কেও ভালোভাবে অবগত করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মামলার শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা (বিশেষ করে এপিপি বা এজিপি) আদালতে উপস্থিত থাকেন না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন : আদালতে একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করানোর জন্য বা কাজ দ্রুত করানোর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন আদালতের কর্মচারী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরি ইত্যাদি) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয় বা মামলা পরিচালনার প্রকৃত বা প্রাক্কলিত মূল্য ব্যতীত অতিরিক্ত অনেক অর্থ প্রদান করতে হয় বলে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের নিয়মবহির্ভূত অর্থ নেওয়ার সংস্কৃতি প্রচলিত থাকায় এটি একটি আবশ্যিক নিয়ম বা প্রথায় পরিণত হয়েছে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না বা হলেও তা সময়মতো সম্পন্ন হয় না বলে ব্যাপক অভিযোগ লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন কাজে, যেমন মামলা দায়েরের জন্য, হাজিরা দেওয়া, কোনো নথি দেখা, শুনানির জন্য তারিখ (লং ডেট বা শর্ট ডেট, অর্থাৎ শুনানির তারিখ পিছিয়ে নেওয়া বা এগিয়ে আনার জন্য) নেওয়া, জবানবন্দি গ্রহণের পর স্বাক্ষর দেওয়া, মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কোনো পিটিশন দেওয়া, ইনজানকশনের অ্যাফিডেফিট করা, কোনো ডকুমেন্টের সত্যায়িত কপি উত্তোলন, সমন বা নোটিশ জারি করার জন্য, এজাহারের কপি উত্তোলন, বেলবন্ড জমা, রায়ের জাবেদা কপি উত্তোলন ইত্যাদির জন্য আদালতের বিভিন্ন কর্মচারীকে অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে কাজ না হওয়া বা দেরিতে হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ ধরনের অর্থ নেওয়ার পরিমাণ কোথাও নির্দিষ্ট নয়; বরং তা মামলার ধরন, গুরুত্ব, বিবাদী বা আসামির সংখ্যা, কাজের জরুরি ভিত্তি, বিচারপ্রার্থীর সামর্থ্য ও এলাকার ওপর নির্ভর করে। কিছু কাজের জন্য অর্থের পরিমাণের পরিসীমা নির্ধারিত রয়েছে এবং এলাকাভেদে অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ওই এলাকাগুলোতে অর্থের লেনদেনের পরিমাণ অন্য এলাকার তুলনায় বেশি। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে বিবাদীর ওপর সমন জারি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সমন যথাযথভাবে জারি না হলে তা মামলাকে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে ফেলে দিতে পারে বা মামলার পক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এ কাজে তুলনামূলকভাবে বড় অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়ম অনুযায়ী আদালত সমন জারির আদেশ দিলে সমনের কপি নিয়ে জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার বিবাদী পক্ষের কাছে যাবেন এবং তাকে সমনের কাগজ দিয়ে মামলা সম্পর্কে অবগত করে সমন যথাযথভাবে জারি হয়েছে এ মর্মে নথিভুক্ত করবেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, সমন যথাযথভাবে জারির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০০ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জারিকারক বাদী ও বিবাদী উভয়ের বাড়িতেই যান এবং টাকা দাবি করেন। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রক্রিয়াকরণ ও নোটিশ জারিতে টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে শুনানির দিন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করার পর নথিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর ও অফিশিয়াল সিল দেওয়ার সময়ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে টাকা (৫০ থেকে ১ হাজার) দিতে হয়।

> “কোর্ট কর্মচারীরা টাকা নেন এটা ওপেন সিক্রেট। মামলা ফাইল করতে শেরেস্তা ১০০-১৫০ টাকা, হাজিরা দেওয়ার সময় ২০ টাকা পেশকারকে, ১০ টাকা পিয়নকে দিতে হয়। নকলের জন্য সরকারি ফি ৩০ টাকা, এটা অনেক সময় তাড়াতাড়ি লাগলে ৩০০-৫০০ টাকা লাগে। এটা উকিল সাহেব নেন ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে।”
>
> *- একজন তথ্যদাতা*

সারণি-১ : দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (পরিসীমায়)

কাজের ধরন	টাকার পরিমাণ (পরিসীমায়)
আরজি দাখিল বা মামলার ফাইলিং সংক্রান্ত কাজ	২০-২০০০
শুনানির দিন হাজিরা	২০-৫০০
শুনানির পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ (সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া)	১০০-১০০০
আরজি সংশোধন	১০০-৩০০
সমন জারি	২০০-১০০০০
সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণসংক্রান্ত কাজ (সিল, স্বাক্ষর ইত্যাদি)	৫০-১০০০
সাক্ষীর জেরা বা জবানবন্দির কপি তোলা	১৫০-১০০০
নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ প্রক্রিয়াকরণ	১০০-২০০০
নথি দেখার জন্য	৫০-১০০০
শুনানির জন্য আদালতে নথি উপস্থাপন	৫০-৫০০
রায়ের নকল বা জাবেদা নকল (ফলিওর ওপর নির্ভর করে, ফলিও প্রতি ৫০-৬০ টাকা)	২০০-৫০০০

এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে যদি মামলার প্রয়োজনে সাক্ষীর জেরা বা জবানবন্দির নথি দেখার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে কপি তোলার জন্য ১৫০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। একইভাবে মামলার কোনো নথি দেখার জন্য এবং আদালতে নথি উপস্থাপনের জন্যও টাকা দিতে হয়। রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি অর্থ লেনদেন হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নকলখানায় রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের আবেদন অনেক বেশি থাকে এবং সবাই জরুরি ভিত্তিতে এ কপি চান। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অফিসেই এই কপি টাইপ করে বা প্রস্তুত করে সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা বাইরে থেকে ফলিও (নির্ধারিত কাগজ) কিনে এবং অনেক সময় বাইরে থেকে টাইপ করে এনে সরবরাহ করা হয়। রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফির বাইরে ২০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এই টাকার পরিমাণ রায়ের আকার (কত পৃষ্ঠার রায়), ফলিও সংখ্যা (ফলিও প্রতি রেট নির্ধারিত থাকে) ও জরুরি প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরাও বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে অর্থ আদায় করে থাকেন। কোনো ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয়ের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন সাক্ষীর শুনানি করার জন্য, কোনো নথি সিন করার জন্য, জেরা করার সময় বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সময় যথাযথ ভূমিকা না রাখাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের ঘুষ বা অর্থ দিতে হয়। এমনকি মামলার দুই পক্ষ আপস করে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেও রাষ্ট্রপক্ষের

আইনজীবীদের অর্থ প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সে ক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কয়েকটি এলাকায় অভিযোগ পাওয়া গেছে যে মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের যোগসাজশ কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকের নাম করে টাকা নেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বিচারক তার কিছুই জানেন না। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহার বা আইনজীবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আইনজীবীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হলে স্বাক্ষর দিতে না চাওয়া এবং অর্থ দাবি করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় আদালত কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানার দাবি পরিশোধের আদেশের পর মোহরানার টাকা গ্রহণের সময় জোরপূর্বক ওই টাকার অংশ (আইনজীবী ফির বাইরে) আদায় করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবী ও তাদের সহকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির (যেমন বিচারক, পিপি বা জিপি বা আদালতের কর্মচারী ইত্যাদি) নাম ভাঙিয়ে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য চাপ : আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার জন্য প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে আদালতের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (যেমন বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী) নানা ধরনের তদবির, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ বা রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারকদের কাছে কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিচারিক কার্যক্রম বা মামলার কার্যক্রম সম্পর্কিত (জামিন দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, কারও পক্ষে রায় দেওয়া, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি) তদবির ও চাপ আসে। তদবির না শুনলে অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে নিরপেক্ষ না থাকা, শাস্তিমূলক বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বিভাগীয় তদন্ত, হয়রানি, বাজেট ঠিকমতো না দেওয়া, অবসর ভাতা পেতে কষ্ট হওয়া, বদলির অর্ডার (জিও) না হওয়া ইত্যাদি। আবার কিছু ক্ষেত্রে আদালত পরিদর্শনের সময় এমনকি ব্যক্তিগত ভ্রমণকালেও (নিজ জেলা বা পর্যটন এলাকা) অতিরিক্ত প্রটোকল ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবেদনশীল বিষয়ে বিচারকালে বিচারকরা মানসিক চাপ অনুভব করেন এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন ও ভাঙচুর ইত্যাদি বিষয়ে একধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন।

ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

বিচারপ্রার্থীদের অসচেতনতা : গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা (বিশেষ করে দরিদ্র বিচারপ্রার্থীরা) তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। এ ছাড়া আদালতগুলোতে খুব বেশি তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকায় বিচারপ্রার্থীদের এ ক্ষেত্রে মুহুরি,

দালাল ও আইনজীবীদের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হয় এবং তারা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হন।

মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা : বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে তৈরি ব্যবস্থা ও আইন দ্বারা পরিচালিত। এ ব্যবস্থায় মামলা দায়ের থেকে শুরু করে মামলার রায় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিচারিক ক্ষেত্র, দ্বৈত অবস্থান ও ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কর্তৃত্বের সংঘাত, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিগত জটিলতা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভীতির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং বিভিন্নভাবে কোর্ট কর্মচারী ও আইনজীবীদের কাছে জিম্মি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

মামলার দীর্ঘসূত্রতা : বিচারক স্বল্পতা, আদালতের অবকাঠামোগত ঘাটতি, আইনজীবীদের অদক্ষতা ও ব্যবসায়িক মনোভাব এবং পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে মামলার দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। সাধারণ বিচারপ্রার্থী অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে পড়ার কারণে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত না করার ক্ষেত্রে মামলার এ দীর্ঘসূত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মামলা পরিচালনায় ব্যয় : মামলা পরিচালনার জন্য বিচারপ্রার্থীদের আইনজীবীর দক্ষতার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে মামলা পরিচালনার জন্য উচ্চ মূল্যের ফি নির্ধারণ ও মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলমান রাখার প্রবণতা কোনো কোনো আইনজীবীর মধ্যে দেখা যায়। ফলে বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া মামলা পরিচালনায় পদ্ধতিগত জটিলতা ও প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও কোর্ট কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত দুর্নীতির কারণে মামলা পরিচালনায় বিচারপ্রার্থীদের অনেক খরচ বহন করতে হয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জীবিকা নির্বাহের নিয়মিত কাজ বন্ধ করে মামলার কারণে আদালতে উপস্থিত হতে হয়। এ কারণে মামলা পরিচালনার প্রকৃত ব্যয় অত্যধিক হয়ে থাকে। দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের এ ব্যয় বহন করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

হয়রানি : গবেষণায় দেখা গেছে, বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, অনেক বিচারপ্রার্থীকে মামলার শুরুতে আইনজীবী খুঁজে পেতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, আইনজীবী ও তাদের মুহুরিরা অনেক সময় বিচারপ্রার্থীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এই আচরণ টাকার পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন হাজিরার সময় বেশি টাকা দিলে ভালো ব্যবহার করেন, নয়তো খারাপ ব্যবহার করেন। এ ছাড়া তথ্যদাতারা বলেছেন, আইনজীবীরা অনেক সময় বিচারপ্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় দেন না। এ ছাড়া নারী, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক বা দরিদ্ররা আদালতে এসে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তথ্যদাতারা আরও

জানিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা আইনজীবীদের সঙ্গে সহজে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন না; বরং আগে আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি : তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিচারপ্রার্থীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন না এবং নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আদালতে আসার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভয় বা শঙ্কা কাজ করে। অনেক আদালতে কক্ষ নির্দেশনা না থাকা বা পড়তে না জানার কারণে আদালতে এসে কোথায় যাবেন বা কোথায় গেলে সঠিক সেবা পাবেন তা বিচারপ্রার্থীরা বুঝতে পারেন না। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, বিচারপ্রার্থীরা হয়তো আসতে একটু দেরি করলেন, তখন আইনজীবী বা মুহুরি বকাঝকা করেন। বলেন, মামলার সাক্ষীর হাজিরা আজ হবে না। আবার অনেক সময় হুমকি দেন এই বলে যে, 'তোমার মামলার বিষয়ে তুমি ভালো বলতে পারোনি, তোমার জন্যই মামলা নষ্ট হবে, তুমিই দায়ী থাকবা।'

সহায়ক পরিবেশ : গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো আদালতেই প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই, এমনকি লিফটও অনেক আদালতে সচল নেই। তাই প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীদের চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, বিচারপ্রার্থীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাভেদে বৈষম্যের শিকার হন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী বিচারপ্রার্থীদের সঙ্গে আইনজীবী ভালো ব্যবহার করেন, সময় দেন এবং তুলনামূলক দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের তেমনভাবে গুরুত্ব দেন না। একজন বিচারপ্রার্থী বলেছেন, 'দরিদ্র বিচারপ্রার্থী হিসেবে আদালতে এসে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাই নাই। আমার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায় নাই, আমি গরিব বলে। আদালতের সবাই আমার থেকে অনেক টাকা নিয়েছে, কিন্তু আমার কোনো কাজ করে নাই।'

জাতীয় আইনগত সহায়তাব্যবস্থা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

কিছু ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা প্রদান-সংক্রান্ত নানা ইতিবাচক উদ্যোগ ও অনুকরণীয় ভালো দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানে জন্য জনবলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আইনগত সহায়তা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লিগ্যাল এইডের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান। অনেক এলাকায় দেখা গেছে যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা নেই। আইনগত সহায়তাপ্রাপ্তিতে বিচারপ্রার্থীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্যানেল আইনজীবীরা অনেক সময় আইনগত সহায়তা প্রার্থীদের কাছ থেকে নিয়বহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে বিবাদী ও বাদী উভয় পক্ষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। আইনগত সহায়তার সেবা সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি এবং বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে

এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। আবার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার বিষয়টি অনেকটা শহরকেন্দ্রিক।

অধস্তন আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

গবেষণায় দেখা গেছে, অধস্তন আদালতগুলোর তদারকির ক্ষেত্রে একটি দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিরাজ করছে; যার কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কারণে প্রকৃত অর্থে কার্যকরভাবে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের সুফল ভোগ করা যাচ্ছে না। বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়গুলো আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায়[১৮] কিছু ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের ওপর প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া বিচারকরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের তদবির ও চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, যা তাদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

এ গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে অধস্তন আদালতগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা-সংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি অন্যতম। অধস্তন আদালতগুলোতে অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আদালত থেকে তথ্যপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা বা তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, আদালতে তথ্য পেতে সংশ্লিষ্টদের নানা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। আদালত প্রাঙ্গণে আদালতের সেবা বা মামলাসংক্রান্ত সাধারণ তথ্যসংবলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার না থাকা, কোন তথ্য কীভাবে কোন জায়গায় পেতে হবে, সে সম্পর্কেও কোনো দিকনির্দেশনা না থাকা, তথ্যকেন্দ্র না থাকা, পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, নিয়মিত অডিট বা আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া আদালতের বিচারিক, প্রশাসনিক ও মামলা পরিচালনার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কার্যক্রম জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ও যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে। দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। যেমন আইনজীবীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের মামলা পরিচালনার কার্যক্রমের কোনো তদারকি করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বার্থের সংঘাতের কারণে জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া গবেষণায় আরও দেখা যায়, কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকিতেও ঘাটতি বিদ্যমান এবং তাদের অনিয়ম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এসবের ফলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে, দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে আদালতে জবাবদিহি কাঠামো

কার্যকর হচ্ছে না। এ ছাড়া দেখা যায় যে আদালতে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা না থাকায় দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য প্রকাশিত হয় না এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

এ ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হার অনেক কম। তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন, অনেক ক্ষেত্রে আদালতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, আইনজীবীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, সাধারণত বিচারপ্রার্থীরাও দুর্নীতি বা হয়রানির অভিযোগ জানাতে চান না। কারণ অভিযোগ করলে মামলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বার কাউন্সিলও অভিযুক্ত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া অধস্তন আদালতে সরকারের অন্যান্য বিভাগের মতো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনার কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ গবেষণায় আরও দেখা যায়, বাংলাদেশের মামলা ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে; যার দরুন মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

গবেষণায় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে আদালতের সুশাসনের ঘাটতির কারণে আদালতগুলোর বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে; যার ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রতা বা মামলাজট সৃষ্টি হচ্ছে। আদালতে সুশাসনের ঘাটতি, বিশেষ করে জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ঘাটতির ফলে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে নিয়মে পরিণত হচ্ছে। বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন মামলা চলমান থাকা, তথ্য না পাওয়া এবং দুর্নীতির শিকার হওয়া অন্যতম।

সারণি ২ : অধস্তন আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা • প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (আইনি, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি) • কার্যকর জবাবদিহির ঘাটতি • স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি • মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা	• মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্টের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন • বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাজট • দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন • বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভোগান্তি • বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকির সৃষ্টি	• বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হওয়া • বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন • বিচারপ্রার্থীদের আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীতির সৃষ্টি • ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি

সার্বিকভাবে এ গবেষণায় দেখা যায়, অধস্তন আদালতে সুশাসনের ঘাটতির নানা বিরূপ প্রভাব রয়েছে। সুশাসনের ঘাটতির ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা পরিচালনা ও নানা ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হওয়ার ফলে বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অধস্তন আদালতে সুশাসনের ঘাটতির সামগ্রিক প্রভাব হিসেবে বিচারপ্রার্থীদের মনে আদালত সম্পর্কে ভীতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে আদালতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয় বা টাকা ছাড়া আদালতে কোনো কাজ হয় না। মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাজট, বিদ্যমান নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি সৃষ্টির ফলে কিছু ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

সুশাসন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আদালতের ভূমিকা অপরিহার্য। নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও আদালতব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধস্তন আদালতের ওপর একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে, যা কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া এ গবেষণায় অধস্তন আদালতব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ, কার্যকর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব কারণে কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত এবং মামলাসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। ফলে বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আদালতব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির বৃদ্ধি একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির সৃষ্টি হচ্ছে আবার দুর্নীতির কারণেও মামলার দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে।

সুপারিশ

অধস্তন আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে ন্যায়বিচার প্রদান, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আদালতব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে। এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের

জন্য সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকার ও নাগরিক সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে–বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

৪. দেশের সব অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বিচারকদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।

৬. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৭. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

৮. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে–বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৯. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সব অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১১. নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বার্ষিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

১২. বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি দ্রুত গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং বিচারিক কর্মকর্তাদের আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে–

- প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন অফিস (যেমন নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
- বিচারক ও আদালতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর আয় ও সম্পত্তির বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রকাশ এবং হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. আইনজীবীদের জবাবদিহি বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১৫. প্রতিটি জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ

১৬. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যেকোনো দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

অন্যান্য

১৮. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] http://www.supremecourt.gov.bd/resources/contents/Bani_of_HCJ_2017.pdf (১৭ অক্টোবর ২০১৭)।

[২] http://www.judiciary.org.bd/department-of-justice/ (৬ মে ২০১৭)।

[৩] সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাজদার হোসেন মামলা, যা মূলত মাজদার হোসেন মামলা নামে অভিহিত করা হয়।

[৪] উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত আদালতগুলোকে চৌকি আদালত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

[৫] ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সব আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৫টি এবং শুধু অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৭ লাখ ১২ হাজার ১২১টি।

[৬] পরিকল্পনা কমিশন, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫-১৬/২০১৯-২০*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2017/02/7th-Five-Year-Plan-Bangla-Book.pdf(৬ জুন ২০১৭)।

[7] এ প্রসঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, 'এ দেশের যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, সেখানে বিচার বিভাগ আলাদা কোনো দ্বীপের মতো নয় যে, সব জায়গায় অনিয়ম থাকবে আর বিচার বিভাগের সব ফেরেশতা হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না।'- *প্রথম আলো*, ২ এপ্রিল ২০১৬;
সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বলেছেন, 'আপনাদের অনেকেই নাজিরদের সঙ্গে অর্থ (টাকাপয়সা) লেনদেন করেন। তাদের কাছ থেকে তোলা নেন বলেও আমার কাছে তথ্য রয়েছে। নাজিরদের কাছ থেকে আর তোলা নেবেন না।' সূত্র : *প্রথম আলো*, ১৩ নভেম্বর, ২০১০

[8] ইউএনডিপি, *অ্যাকসেস টু জাস্টিস ইন বাংলাদেশে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস : সামারি রিপোর্ট*, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০১৫।

[9] ইউএনডিপি, *প্রাগুক্ত*।

[10] হামিদুল হক, *'বিচার-প্রক্রিয়া : দেওয়ানি ও ফৌজদারি'*, ঢাকা, ২০১৭; মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ মিয়া, '*ফৌজদারি বিচার কার্যক্রম*', ঢাকা, ১৯৯৩; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, '*প্রতিবেদন : জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬*'; সরকার আলি আক্কাস, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব জাজেস : আ কি ইস্যু অব জুডিশিয়াল ইনডিপেনডেন্স', *বন্ড ল রিভিউ*, ভলিউম ১৬ : ইস্যু ২, পৃ. ২০১।

[11] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : ১৭ বিচারকের বিদেশ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা', ২৩ মে, ২০১৭।

[12] দৈনিক *ইত্তেফাক*, 'এখনো পৃথক হয়নি বিচার বিভাগ, চলছে দ্বৈত শাসন', ১ নভেম্বর, ২০১৬।

[13] জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ : প্রধান বিচারপতির বক্তব্য।

[14] *প্রাগুক্ত*।

[15] যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য ১০৭ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন এবং ভারতে ১৮ জন বিচারক রয়েছেন।

[16] http://jati.judiciary.org.bd/jati-training/training-courses (২ নভেম্বর ২০১৭)।

[17] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'সহকারী জজ নিয়োগে সময় বেশি লাগছে বিসিএসের চেয়েও', ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

[18] 'এখনো পৃথক হয়নি বিচার বিভাগ চলছে দ্বৈত শাসন', দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বও, ২০১৬।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার*

শাহজাদা এম আকরাম, জুলিয়েট রোজেটি
নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম

প্রেক্ষাপট

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (এসডিজি)-এর অভীষ্ট ১৬-তে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সবার জন্য ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ'-এর কথা বলা হয়েছে। এই অভীষ্টের মধ্যে আরও যেসব লক্ষ্য রয়েছে, যেমন 'সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাস করা' (১৬.৫); 'সব স্তরে কার্যকর, দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান' (এসডিজি ১৬.৬); 'সব স্তরে সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ' (১৬.৭) এবং 'জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা' (১৬.১০)[১], সেসব লক্ষ্য সরাসরি সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের মাধ্যমে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-তে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম।[২] এই শুদ্ধাচার কৌশলে এসব দলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ও আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

*২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত কার্যপত্রের সারসংক্ষেপ।

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য, আওতা ও তথ্য সংগ্রহ-পদ্ধতি

এই কার্যপত্রের উদ্দেশ্য সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করা এবং আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার-সংক্রান্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই কার্যপত্রে একাদশ সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দল, যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত ইশতেহার এ কার্যপত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই কার্যপত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রধানত প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, নির্বাচনী ইশতেহার ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও বিশ্লেষণ। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল, সুশাসন ও শুদ্ধাচার : মূল ধারণা

রাজনৈতিক দল : প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে যথাযথভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক দল, যা ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বলতে 'এমন একটি অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কার্য করেন এবং কোনো রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসংঘ হইতে পৃথক কোনো অধিসংঘ হিসেবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন'।[৩] বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক মত প্রচার বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করা এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের অঙ্গীকার নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা। রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া[৪] এবং প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করা, সরকার গঠন করা, নীতিগত অবস্থান ও কার্যক্রম তৈরি করা, রাজনৈতিক নিয়োগ ও সামাজিকীকরণ, প্রতিনিধিত্ব করা, সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ করানো, ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়া ও জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়তা করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠন করা–সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহায়তা করা। সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫] সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত

করা, বিরোধী দল হিসেবে সরকারের সমালোচনা করা, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সুশাসন : সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব নাগরিক তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে, আইনি অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ভিন্নমত পোষণ করতে পারে।[৬] এ ছাড়া বিভিন্ন নীতি তৈরি ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতাকে সুশাসন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সর্বোপরি, এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কার্যক্রম তদারকির জন্য কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ওপর নাগরিক ও রাষ্ট্রের আস্থা প্রকাশ করে।[৭] সুশাসনের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা।[৮] এ ছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংঘাতের অনুপস্থিতি, সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা, সমঝোতা, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকেও সুশাসনের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

শুদ্ধাচার : শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বোঝায়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ অনুযায়ী সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছতা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা জরুরি।[৯]

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়া

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়া অনেকটা একই রকম। নির্বাচনের আগে কোনো দলের নির্বাচনী কমিটির অধীনে সাব-কমিটি গঠন করা হয়, যার ওপর থাকে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব। এই সাব-কমিটি একটি খসড়া নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করে এবং তা নিয়ে কমিটিতে আলোচনা করে। আলোচনার ভিত্তিতে খসড়া সংশোধন ও দলের সভাপতির কাছে তা পেশ করা হয়। সভাপতির মতামতের ভিত্তিতে এটি আবার সংশোধন ও চূড়ান্ত করা হয়। সবশেষে চূড়ান্ত নির্বাচনী ইশতেহার দলীয় সভাপতির অনুমোদনক্রমে ঘোষিত হয়। তবে বাস্তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কয়েকজনের ওপর নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব থাকে বলে দেখা যায়। নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া দলীয় উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হয় এবং দলীয় প্রধানের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়। সব ক্ষেত্রেই দলীয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে বলে জানা যায়।[১০]

সুশাসন ও শুদ্ধাচার : রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ (ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন) সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দলটি অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।[১১] দ্বিতীয় (১৯৭৯) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মূল অঙ্গীকার ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়।[১২] পঞ্চম (১৯৯১) ও সপ্তম (১৯৯৬) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল যথাক্রমে গণতান্ত্রিক সরকার ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন, সংবিধানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দলীয় প্রভাব, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় রেডিও-টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও সব নাগরিকের সমান অধিকার খর্ব করে এমন আইন বাতিল করা।[১৩] একইভাবে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০১) অঙ্গীকারে নতুনভাবে সংযোগ করা হয় সংসদে নারীদের আসন বাড়ানো, স্বাধীন দুর্নীতি দমন পরিষদ প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা।[১৪]

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অঙ্গীকার ছিল সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত, যা '২০২১ সালের রূপকল্প : দিনবদলের সনদ' নামে প্রকাশিত। এই নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম মূল অগ্রাধিকার ছিল গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; বিচার বিভাগের দৃশ্যমান স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা; দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি, দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা; তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়ে অঙ্গীকার ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৫]

সর্বশেষ ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করা ও সংসদের ভেতরে-বাইরে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন; ন্যায়পাল নিয়োগ; মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করা; সরকারের সব পর্যায়ে ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন; বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি, দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের

স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার রোধে আইন ও নীতি তৈরির অঙ্গীকার করা হয়।[১৬]

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারে মূল কেন্দ্রবিন্দু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অঙ্গীকার ইশতেহারে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, যেমন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসন, ন্যায়পাল নিয়োগ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, অবাধ তথ্যপ্রবাহসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে সাম্প্রতিক সমস্যা, যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অপব্যবহার রোধ, ই-গভর্নেন্স ইত্যাদি যুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) : ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএনপি তৃতীয়, চতুর্থ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই রাজনৈতিক দলটি দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে, যেখানে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের সব স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করা হয়।[১৭] পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ইশতেহারে ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার করা হয়।[১৮] পরে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি; ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা; নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা; রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা; গ্রাম সরকার প্রবর্তন এবং সংসদে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসন বাড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়।[১৯]

সর্বশেষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ইশতেহারে সব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন; সুশাসনের কেন্দ্র হিসেবে সংসদের ভূমিকা বাড়ানো ও বিরোধী দলের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা; বিষয়ভিত্তিক ব্যতীত ওয়াকআউট ও অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ আরোপ; সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম সরকার প্রবর্তন; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও ডিজিটাল কেস ডেটাবেইস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; দুর্নীতির উৎস বন্ধ করা, সরকারের সব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; সব সংসদ সদস্যকে শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে বাধ্য করা এবং দুদকের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি তৈরি করার অঙ্গীকার করা হয়।[২০]

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারগুলো পর্যালোচনা করলে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখা যায়।

জাতীয় পার্টি (জাপা) : ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে জাপা অংশগ্রহণ করলেও ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করা হয়নি বলে জানা যায়।[২১] জাপার নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা; উচ্চ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো; সব ধরনের 'কালো আইন' বাতিল করা; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের আসন ৬৪টি করা; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণ উপজেলাব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকারগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে দশম সংসদ নির্বাচনে ওপরের অঙ্গীকারগুলোসহ 'প্রাদেশিক কাঠামো'ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং স্থানীয় উন্নয়নে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার করা হয়। জাপার নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতে মূলত প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ধারাবাহিক অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়।[২২]

অন্যান্য দল

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : এই দলের ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা (স্থায়ী কমিটির গণশুনানি, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন); তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (পুলিশ কমিশন গঠন); স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি দমন (দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, দুর্নীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি) অঙ্গীকার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।[২৩]

ওয়ার্কার্স পার্টি : ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই দলের ইশতেহারে প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন; দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি রোধ (রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত); প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ; দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগে; মেধার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ; দ্রুত বিচার; কার্যকর সংসদ (নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন); তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।[২৪]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : ২০০৮ সালের ইশতেহারে ঘুষ-দুর্নীতি কমানো; ন্যায়পালব্যবস্থা চালু; দুদকের সক্ষমতা বাড়ানো; ক্ষমতার কার্যকর গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনের কাঠামো পুনর্বিন্যাস; সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল : ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনি কাঠামো পরিবর্তন; জাতীয় সরকার গঠন; অবৈধভাবে অর্জিত সব অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা; সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা; সামাজিক নিরাপত্তা; স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন; সম্পদের হিসাব প্রকাশের অঙ্গীকার করা হয়।[২৫]

গণফোরাম : ২০০৫ সালে প্রস্তাবিত ২৩ দফায় আইনের নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রয়োগ, মৌলিক অধিকার-পরিপন্থী সব আইন ও বিধি বাতিল; বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ; প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দলীয়করণ বন্ধ, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান; নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথককরণ করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা; জাতীয় সংসদকে সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা; সর্বস্তরের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও ক্ষমতায়ন করে শক্তিশালী ও কার্যকর করা; মন্ত্রী, এমপিসহ সব দলে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও তার নিয়মিত তদারকি; ঋণখেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অসদুপায়ে অর্জিত সব অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদপত্র ও রেডিও-টেলিভিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান; অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ : ২০০৮ সালের ইশতেহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া; চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ও অসৎ নেতৃত্বমুক্ত রাখতে জনমত গড়ে তোলা; রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে দলভিত্তিক সংসদ নির্বাচন; জনপ্রতিনিধিসহ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীর দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তিন গুণ শাস্তির ব্যবস্থা; রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন গঠন; সব পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানজনক বেতন-ভাতা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও পদোন্নতির ব্যবস্থা; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সব গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।[২৬]

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক দলগুলোর সুশাসন প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দেখা যায়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা), বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক আইন ও নীতি প্রণয়ন (সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ ছাড়া সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা, নির্বাচনে ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ, সরকারি বিভিন্ন সেবা ও ক্রয়ে ডিজিটালাইজেশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গণশুনানি প্রবর্তন করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে প্রশাসনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সততা পুরস্কারনীতি ২০১৭ প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনিক শুদ্ধাচার চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধনের মাধ্যমে সবগুলো দলের বার্ষিক আর্থিক তথ্য ও নির্বাচনী ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে।[২৭]

কিন্তু যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও দেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় ধরনের দুর্নীতির বিস্তার লক্ষ করা যায়। সরকারি সেবা খাতে ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বলে দেখা যায়। টিআইবি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী সেবাগ্রহীতা খানার ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার।[২৮] এ ছাড়া সুশাসন ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান ধারাবাহিকভাবে নিচের দিকে রয়েছে। বিভিন্ন দলীয় সরকারের সময়ে দুর্নীতিবিরোধী আইনের প্রয়োগে কাঠামোগত বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিধান করা বা কোনো কোনো খাতে সরকারের জবাবদিহি করার ব্যবস্থা সংকুচিত করা।

জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির বৈঠক নিয়মিতভাবে না হওয়া, সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের ঘাটতি, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের অজুহাতে সংসদ সদস্যদের মতপ্রকাশে কাঠামোগত বাধা, সংসদে বিরোধী দলের বয়কট থেকে শুরু করে আত্মপরিচয়ের সংকটাপন্ন বিরোধীদলীয় সংস্কৃতি, সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিকতর আগ্রহের সংস্কৃতি, সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য আইনের ঘাটতি, স্থায়ী কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার ফলে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারেনি, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিও নিশ্চিত করা যায়নি।[২৯] রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়। এ ছাড়া একই প্রভাবে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগ থেকে শুরু করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষণীয়।[৩০]

অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা ও চর্চা বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬ ও প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন বা আইনের ধারা (যেমন বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪) কখনো বাতিল করেনি। এ ছাড়া প্রতিটি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও এ পর্যন্ত ক্ষমতায় যাওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, উপরন্তু কর ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়ার পরও তা বিলুপ্ত করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো অডিটকৃত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করলেও এসব তথ্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত নেই।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক লক্ষ করা যায়। ইতিবাচক দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন এবং এর অংশ হিসেবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবিতে সামরিক শাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বর্জন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন; যার

মাধ্যমে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা।[৩১] গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সংসদ ও স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে দেখা যায়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতাকে একচ্ছত্রভাবে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বিদ্যমান–ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নির্বাচনে হেরে গেলে ফলাফল মেনে না নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি আস্থা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া বেশির ভাগ দলে নেতৃত্ব নির্বাচন, নারীদের অংশগ্রহণ, সম্মেলন আয়োজন, স্থানীয় কমিটি গঠন, প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চায় ঘাটতি দেখা যায়।[৩২]

উপসংহার

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যেখানে স্বাধীনতার আগের নির্বাচনে (১৯৭০) মূল অঙ্গীকার ছিল সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সেখানে ১৯৭৫ সালের পর থেকে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আরও পরে ১৯৯০-এর দশকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, একে কার্যকর ও শক্তিশালী করা, সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম আরও দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ করার অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়।

প্রধানত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে বেশির ভাগ দলের ইশতেহারে দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার দেখা যায়, যার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বাধীন দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে, দুর্নীতির আরও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

বেশির ভাগ দলের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়, যেমন ন্যায়পাল নিয়োগ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি), 'কালো আইন' বাতিল (আওয়ামী লীগ, জাপা), স্বাধীন বিচার বিভাগ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা), স্বাধীন গণমাধ্যম (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা), জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ (বিএনপি), গ্রাম সরকার প্রবর্তন (বিএনপি) বা উপজেলা আদালত ও প্রাদেশিক সরকার গঠন (জাপা)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ দলের অনেক অঙ্গীকার থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো কোনো অঙ্গীকার পূরণ করা হলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার, যেমন কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পাল নিয়োগ, 'কালো আইন' বাতিল, জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি কখনোই পূরণ করা হয়নি বলে দেখা যায়। অন্যদিকে

বাক্‌স্বাধীনতা, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার মতো বিতর্কিত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সব দলই সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন অঙ্গীকার করলেও বিরোধী দল হিসেবে ইশতেহারে অঙ্গীকারকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শুদ্ধাচার চর্চার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফলে ইশতেহারের প্রভাব লক্ষণীয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে ইশতেহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

সুপারিশ

কার্যপত্রে আলোচিত বিষয় বিবেচনা করে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. সরকার গঠনকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পূর্ববর্তী নির্বাচনে দেওয়া অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করেছে, সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

২. নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন না করতে পারলেও বিরোধী দল হিসেবে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা থাকবে তা ইশতেহারে স্পষ্ট করতে হবে।

৩. প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুসরণ করে, কর্মপরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন ও প্রতিবছর তা পর্যালোচনা করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে হবে। এসব অঙ্গীকার কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও থাকতে হবে।

৫. সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিচের বিষয়গুলো ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ক. সংসদ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৬)

- সংসদে সরকারি দলের একচ্ছত্র ভূমিকার চর্চা নিরুৎসাহিত করতে বৈধ ও আগ্রহী সব দলের কার্যকর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও নির্বাচিত সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; দলীয় প্রধান, সরকারপ্রধান ও সংসদ নেতা একই ব্যক্তি না হওয়া।
- বিরোধী দলকে সংসদীয় কার্যক্রমে আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া (ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ, সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত কমিটিসহ এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন)।
- সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন; সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং এসব তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করা।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করা; উদাহরণস্বরূপ একই সঙ্গে শ্রমিক বা মালিক ইউনিয়নের নেতা ও

মন্ত্রিত্বের পদে আসীন না হওয়া; জনপ্রতিনিধি বা সরকারি পদে আসীন হয়ে সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো লাভজনক কর্মকাণ্ডে নামে-বেনামে সম্পৃক্ত না হওয়া।

- সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ও এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর সব পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চা বৃদ্ধি করা; দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা; রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা।

খ. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার চর্চাসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৪, ১৬.৫)

- দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও কমিশনার বা সদস্যসহ সব নিয়োগ বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা পরিহার করা এবং প্রয়োজনে সংস্কার করা।
- এমন কোনো আইনি সংস্কার না করা, যা দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা খর্ব করতে পারে।
- সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি-প্রক্রিয়া মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা।
- রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা প্রত্যাহার বন্ধ করা।
- জাতীয় বাজেটে কালোটাকাকে বৈধতা না দেওয়া; পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত নিয়ে আসা।
- সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ও গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা।
- উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত, বাস্তবসম্মত এবং জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন করা– প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার চর্চা প্রতিষ্ঠিত করা; প্রকল্পের বাস্তবায়নে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানে নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করা; ক্রয়প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ বা প্রভাব বন্ধ করা; ই-প্রকিউরমেন্টের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ক্রয় নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৩)

- বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারি উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ এবং সব অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।
- বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা।
- বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করা; সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ এবং পদোন্নতি নিশ্চিত করা।
- উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর প্রয়োগ করা।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সব ধরনের আইন ও বিধি বাতিল করা; জবাবদিহি সংকুচিত করে এমন আইন ও বিধি বাতিল করা।
- বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্বিচারে আটকসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা।

ঘ. জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- কেবলমাত্র যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন করা; প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশাসনসহ সব সরকারি খাতে আধুনিক কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়িত, গতিশীল ও দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।
- উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করা।

ঙ. নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকারসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য ধর্ম, নারী, শিশু ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহার বন্ধ করা।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের প্রতি বৈষম্যমূলক সব আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩৩ শতাংশ করা ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।

চ. তথ্য অধিকার, মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.১০)

- তথ্যের অভিগম্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনো আইন প্রণয়ন না করা; তথ্য অধিকার আইনবিরোধী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাপরিপন্থী বিভিন্ন নিবর্তনমূলক উপধারা বাতিল করা।
- এমন কোনো আইন না করা যা মুক্ত ও স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের পরিপন্থী, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক সব ধারা এবং বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪ ধারাসহ মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার সাংবিধানিক অধিকার খর্বকারী সব আইন ও আইনের ধারা বাতিল করা; গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্যবসা, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অপ্রকাশযোগ্য বিষয়ের জন্য ব্যতিক্রম সাপেক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, সব ধরনের গোয়েন্দা সংস্থা ও গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা।
- তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের চাহিদা– উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সরকারি মালিকানাধীন বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

তথ্যসূত্র

[১] বিস্তারিত দেখুন https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮).

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ২০১২, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : বাংলাদেশের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, পৃ. ১১।

[৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫২।

[৪] রবার্ট হাক্সহর্ন, *পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন আমেরিকা* (মন্টারিই, সি এ : ব্রুকস/ কোল, ১৯৮৪)।

[৫] থমাস কারোথার্স, *কনফ্রন্টিং দ্য উইকেস্ট লিংক : এইডিং পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন নিউ ডেমোক্রেসিস* (ওয়াশিংটন ডিসি : কারনেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস, ২০০৬); রওনক জাহান, 'পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বাংলাদেশ', *সিপিডি- সিএমআই ওয়ার্কিং পেপার ৮* (ঢাকা, ২০১৪); আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭)।

[৬] ইউএন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (ইউনেসক্যাপ), 'হোয়াট ইজ গুড গভর্নেন্স?' (ব্যাংকক : ইউনেসক্যাপ, ২০০৯)।

[৭] ইউএনডিপি, *গভর্নেন্স ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট* (নিউইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭)।

[৮] ইউনেসক্যাপ, ২০০৯; ইউএনডিপি, ১৯৯৭; বিশ্বব্যাংক, *ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস : বাংলাদেশ*, ১৯৯৬-২০১৪, (ওয়াশিংটন ডিসি : বিশ্বব্যাংক, ২০১৪)।

[৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : বাংলাদেশের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, ২০১২।

[১০] নূহ উল আলম লেনিন, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ; নজরুল ইসলাম খান, সদস্য, স্থায়ী কমিটি, বিএনপি; জি এম কাদের, কো-ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

[১১] *শাহ মোহাম্মদ ফরিদ*, 'ইনটিগ্রেশন অব পভার্টি অ্যালিভিয়েশন অ্যান্ড সোশ্যাল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ইন টু দ্য প্ল্যানিং প্রসেস অব বাংলাদেশ', ইউনেসক্যাপ, ২০০৯;web.archive.org/web/20090326051941/http:/www.unescap.org/drpad/publication/ldc6_2174/chap4.PDF (১৬ আগস্ট ২০১৮)।

[১২] নূহ উল আলম লেনিন, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, ভলিউম ১, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৫)।

[১৩] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার* ১৯৯১, (ঢাকা : আওয়ামী লীগ, ১৯৯১)।

[১৪] নাসরিন সুলতানা ও তমালিকা সুলতানা, 'ইলেকশন মেনিফেস্টো অব টু মেজর পলিটিক্যাল পার্টিজ আফটার নাইনটিজ', আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮)।

[১৫] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ : দিন বদলের সনদ*, (ঢাকা : আওয়ামী লীগ, ২০০৮)।

[১৬] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪ : শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগতি- বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে*, (ঢাকা : আওয়ামী লীগ, ২০১৪)।

[১৭] রওনক জাহান, *পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বাংলাদেশ : চ্যালেঞ্জেস অব ডেমোক্র্যাটাইজেশন*, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫)।

[১৮] নাসরিন সুলতানা ও তমালিকা সুলতানা, ২০১৮; বালাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), *নির্বাচনী ঘোষণা : ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৯৯৬, (ঢাকা : বিএনপি, ১৯৯৬)।

[১৯] নাসরিন সুলতানা ও তমালিকা সুলতানা, ২০১৮।

[২০] বিএনপি, *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার : নবম জাতীয় সংসদ ২০০৮ : দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও*, (ঢাকা : বিএনপি, ২০০৮)।

[২১] জাতীয় পার্টির কো-ভাইস চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[২২] জাতীয় পার্টি (জাপা), *অঙ্গীকার বাস্তবায়নই আমাদের শপথ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮*, (ঢাকা : জাপা, ২০০৮); জাতীয় পার্টি, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ : নির্বাচনী ইশতেহার*, (ঢাকা : জাতীয় পার্টি, ২০১৪)।

[২৩] জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), নবম জাতীয় *সংসদ নির্বাচন ২০০৮ : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির নির্বাচনী ইশতেহার : পরিবর্তনের প্রচেষ্টা*, (ঢাকা : জেএসডি, ২০০৮); জেএসডি, দশম জাতীয় সংসদ *নির্বাচন ২০০৮: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির নির্বাচনী ইশতেহার : সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই আমাদের লক্ষ্য*, (ঢাকা : জেএসডি, ২০১৪)।

[২৪] বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, *দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : নির্বাচনী ইশতেহার*, (ঢাকা : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ২০১৪)।

[২৫] বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ : নির্বাচনী ইশতেহার*, (ঢাকা : সিপিবি, ২০০৮)।

[২৬] ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮:* (ঢাকা : ইসলামী আন্দোলন, ২০০৮)।

[২৭] টিআইবি, *ন্যাশনাল ইনটিগ্রিটি অ্যাসেসমেন্ট : বাংলাদেশ*, (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৪)।

[২৮] টিআইবি, 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ১৬ : প্রিপেয়ার্ডনেস, প্রগ্রেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব বাংলাদেশ : এ স্টাডি অব সিলেকটেড টার্গেটস', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৭)।

[২৯] টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭*, (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৮)।

[৩০] টিআইবি, ২০১৭।

[৩১] দেখুন http://en.banglapedia.org/index.php?title=Six-point_Programme (১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

[৩২] রওনক জাহান, *পলিটিক্যাল পার্টিজ মুভমেন্টস, ইলেকশনস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ*, জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক ডিস্টিংগুইশড লেকচার, ২০১৮।

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, নিহার রঞ্জন রায়
মো. মোস্তফা কামাল ও নাজমুল হুদা মিনা

ভূমিকা

এনজিও[১] খাত তৃতীয় খাত, উন্নয়ন খাত বা সুশীল সমাজের অংশবিশেষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জন-অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের জন্য এনজিও খাতের সুনাম রয়েছে। নানা ধরনের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রয়োগ করে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে এনজিওগুলো বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি পরিচালনা করে। তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণিপেশা-নির্বিশেষে সব মানুষের চাহিদা ও দাবি-দাওয়া রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি সরকারি সেবা প্রদানে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[২]

উন্নয়নশীল বিশ্বে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে এনজিওর ভূমিকা স্বীকৃত। বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের নানা মডেল ও কর্মপন্থা এবং চাহিদা অনুসারে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ, পুনর্বাসন, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ সেবা ও সহায়তা দেওয়ার মধ্য দিয়ে এনজিও কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। পরে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা, পানি-স্যানিটেশন, ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে এনজিও খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এনজিওর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা লক্ষণীয়– বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও নারীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে।

---

*২০১৮ সালের ২ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিওর সক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ করে যে এনজিও কর্মকাণ্ডে অধিকতর গণতান্ত্রিক চর্চা এবং সুশাসনের উন্নততর পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। বাস্তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশে কার্যরত এনজিওগুলোর সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো, বাংলাদেশে এনজিও খাতে সুশাসনের ঘাটতি[৩]; এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতি[৪] ইত্যাদি। উল্লেখ্য, টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ অনুসারে দেশের এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার (৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ) মধ্যে ৩ দশমিক শূন্য শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যান্য খাতের তুলনায় (সার্বিকভাবে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ) এ হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশের এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসনের ঘাটতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা বিবেচনার দাবি রাখে।

জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২ হাজার ৬২৫টি।[৫] এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওর মধ্যে ৪৮০টি এনজিও দীর্ঘ সময় ধরে নিবন্ধন নবায়ন না করায় তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওগুলোকে কাঠামোগত কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের অযাচিত প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বেশ কতকগুলো যৌক্তিক কারণে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতির ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী (২০০৭) গবেষণার ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে এই গবেষণায় পূর্ববর্তী ও বর্তমান পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়ত, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিওর সহায়ক ভূমিকা জোরালো করতে এনজিওর অভ্যন্তরীণ সুশাসন চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা; তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট, কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি, উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার পরিবর্তনসহ নানা কারণে বাংলাদেশের এনজিও খাতে তহবিল প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং এ প্রেক্ষাপটে তহবিল প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি এবং সে ক্ষেত্রে এনজিওর অভ্যন্তরীণ সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে—এ বিষয়টি গবেষণা ও আলোচনার দাবি রাখে; চতুর্থত, এনজিওর অভ্যন্তরীণ সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদারকি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগীদের ধারণা প্রদান এবং এ খাতের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করতে গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও পদ্ধতি

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিওগুলোর সুশাসনের চর্চা পর্যালোচনা করা;
- এনজিওগুলোর অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং
- এনজিওগুলোর সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় প্রস্তাব করা।

এ গবেষণায় এনজিওবিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত এবং বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসন সম্পর্কে একটি প্রতিচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণায় এনজিও-সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা অবধারিতভাবে প্রতিফলিত হলেও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন মূল্যায়ন এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কার্যরত বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সব এনজিও সম্পর্কে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; তবে গবেষণাটি এনজিওগুলোর বিদ্যমান সুশাসন সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি ও তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকে সংগৃহীত ৭৮১টি এনজিওর একটি তালিকা (২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত) থেকে সেগুলোর ধরন (স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক), অনুদানের পরিমাণ (ছোট, মাঝারি, বড়) ও স্থানীয় এনজিওর ক্ষেত্রে বিভাগীয় অবস্থানের ভিত্তিতে এনজিওগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারপর সেখান থেকে পদ্ধতিগত দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫০টি এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে দুটি স্থানীয় এনজিও তথ্য প্রদানে সম্মত হয়নি; অর্থাৎ এ গবেষণাটি ৪৮টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২৪টি জাতীয়, ৯টি আন্তর্জাতিক ও ১৫টি স্থানীয় এনজিও রয়েছে।

এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (এনজিও সংশ্লিষ্ট অংশীজন), নিবিড় সাক্ষাৎকার (নির্বাচিত এনজিওর পরিচালনা পরিষদ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা), দলীয় আলোচনা (নির্বাচিত এনজিওর কর্মী), ফোকাস দল আলোচনা (নির্বাচিত এনজিওর উপকারভোগী), আধা কাঠামোবদ্ধ ফরম্যাট পূরণ এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন এনজিওবিষয়ক ব্যুরো কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, নির্বাচিত এনজিওর পরিচালনা পরিষদের সদস্য, প্রধান নির্বাহী বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য, বিভিন্ন

বিভাগের কর্মকর্তা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ, নিরীক্ষা, প্রকল্প বা কর্মসূচি, পরিবীক্ষণ), মধ্যম ও কনিষ্ঠ সারির কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, প্রত্যক্ষ উপকারভোগী, অনুদান প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নিরপেক্ষ গবেষক-মূল্যায়নকারী-পরামর্শক, এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মী। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন (বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন ২০১৬; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন ২০০৬), এনজিও ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্য, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধ, বাছাইকৃত এনজিওর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট। অক্টোবর ২০১৬ থেকে মে ২০১৭ সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওগুলোর ২০১৪-১৬ সময়কার সুশাসন পরিস্থিতি এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি এবং এনজিও সমন্বয়কারী সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিধিরা গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়ন এবং অযাচিত কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

গবেষণার বিশ্লেষণকাঠামো

এই গবেষণায় এনজিওর সুশাসন[৬] ও আইনগত বৈধতা[৭] বিশ্লেষণের বিদ্যমান ধারণা অনুসরণ করা হয়েছে। এনজিওর সুশাসন ও আইনগত বৈধতার বিষয়টি ধারণাগতভাবে জটিল যা বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন আইনের প্রতিপালন[৮], অভ্যন্তরীণ পরিচালনা, মূল্যবোধ ও চর্চার মধ্যে সমন্বয়[৯], প্রতিনিধিত্বশীলতা[১০]; জবাবদিহি, অর্থাৎ যথাযথ সুশাসনকাঠামো ও স্তরায়িত জবাবদিহি ব্যবস্থা[১১] এবং কার্যসম্পাদন[১২]। এই গবেষণায় লিস্টারের[১৩] সুশাসন ও আইনগত বৈধতার ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার মূল ভিত্তি স্কটের[১৪] প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্ব। এই গবেষণায় এনজিওর সুশাসন, আইনগত বৈধতাকাঠামোকে জবাবদিহি, প্রতিনিধিত্বশীলতা, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, সততা ও সক্ষমতা এবং কার্যসম্পাদনের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো সুশাসন ও আইনগত বৈধতা ধারণার চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–নিয়ন্ত্রণমূলক[১৫], ব্যবহারিক[১৬], আদর্শগত[১৭] ও জ্ঞানভিত্তিক[১৮]।

মূলত চারটি সূচকের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কার্যসম্পাদন, স্বচ্ছতা, শুদ্ধাচার, প্রতিনিধিত্বশীলতা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কার্যসম্পাদনের পরিমাপক হিসেবে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপদ্ধতি, কর্মসূচি বাস্তবায়ন; স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের পরিমাপক হিসেবে সংস্থার সাধারণ তথ্যের উন্মুক্ততা, পরিকল্পনা ও বাজেটসংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা, উপকারভোগী নির্বাচনে উন্মুক্ততা, নিয়োগ, ক্রয় ও আর্থিক লেনদেনে নিয়ম ও চর্চা; প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণের পরিমাপক হিসেবে পরিচালনা পরিষদ

গঠন, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কমিউনিটির চাহিদার প্রতিফলন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মতামত নেওয়া, পরিচালনা পরিষদে উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব, উপকারভোগী নির্বাচন, কর্মসূচি গ্রহণ প্রক্রিয়া ও জবাবদিহির পরিমাপক হিসেবে তদারকি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে প্রতিবেদন পেশ, নিরীক্ষা নীতিমালা ও চর্চা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নব্যবস্থা, প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি, অভিযোগ এবং সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগীদের প্রশ্ন ও পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন ২০১৬ প্রণয়ন এবং এর বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও ও সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্তকরণ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর পরিবীক্ষণের উদ্যোগ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিওর তথ্য উন্মুক্ত করার বিধান চালু করা; জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও সমন্বয় জোরদারকরণ; নিবন্ধন নবায়নে ব্যর্থ বা বিলম্বকারী এনজিওর নিবন্ধন বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ; বিভিন্ন ফরম পূরণের মাধ্যমে এনজিওর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ–বিশ্বাসভিত্তিক এনজিওর কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, জঙ্গি অর্থায়ন রোধে সহায়তা এবং অর্থ পাচার রোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী এনজিওর ক্ষেত্রে বিদেশি অনুদান প্রাপ্তিতে বৈধ উৎসের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

আইনি সীমাবদ্ধতা

বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন ২০১৬-এ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ আইনের ধারা ৬-এ দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। আবার উপধারা ৬.৩ অনুযায়ী দেশের অন্যান্য জেলায় কর্মসূচির ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ ছাড়াই মহাপরিচালকের বরাবর আবেদন করার বিধান থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোর ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া উপধারা ৬.৪-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। এ ধারাগুলোর ফলে প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া আইনটির কিছু ধারা ও উপধারায় অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন উপধারা ১০.৭ ও ১০.৮ অনুসারে দেশের অন্যান্য জেলার এনজিও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার

জন্য একটি নির্ধারিত কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। আবার আইনটির ধারা ১১ অনুসারে এনজিওর গঠনতন্ত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর ক্ষেত্রে দেশীয় পর্যায়ে সমান্তরাল কোনো কাঠামো থাকবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নেই। এ ছাড়া আইনটির ধারা ১৪ অনুসারে কোনো এনজিও সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 'বিদ্বেষমূলক' ও 'অশালীন' মন্তব্য করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; তবে এই শব্দদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে আইনটির যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসংবলিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হলেও তা চূড়ান্ত করা হয়নি।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এনজিওগুলোয় সুশাসনের চিত্র

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এনজিওগুলোয় বেশ কিছু ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সুশাসনের ঘাটতিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যসম্পাদন

নীতিমালা ও নির্দেশিকা : গবেষণাভুক্ত সব এনজিওতে গঠনতন্ত্র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ, জেন্ডার ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও নির্দেশিকাপত্র রয়েছে। তবে নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জেন্ডার নীতিমালা থাকলেও বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া; যৌন হয়রানির অপরাধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে না চলা; ক্রয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন উপেক্ষা ইত্যাদি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতিমালা ইংরেজিতে হওয়ায় অনেক কর্মীর কাছে তা সহজবোধ্য হয় না। আবার মাঠকর্মীদের জন্য নীতিমালার ওপর ধারণা প্রদানসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা : অধিকাংশ এনজিওতে (৩৫টি) কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা রয়েছে। এসব এনজিওতে কর্মীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (১৩টি) এনজিওতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয় না।

কর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন : অধিকাংশ এনজিও (২৫টি) কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) কর্মীদের প্রণোদনা ও দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। নিয়মিত কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন কমে যাওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল বরাদ্দ না পাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। কর্মদক্ষতার উন্নয়নে প্রণোদনা বিশেষ ভূমিকা

রাখে। কিন্তু প্রকল্পকর্মীদের জন্য প্রণোদনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রকল্পকর্মীদের জন্য বেতনের বাইরে অন্য কোনো সুবিধা ও নির্ধারিত ছুটি উপভোগের সুযোগ কম থাকার অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন : উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিও (১৯টি) দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সামগ্রিক পন্থায় উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রবণতা লক্ষণীয়। সে ক্ষেত্রে কোনো কমিউনিটিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পরিবর্তন আনা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য বেশির ভাগ এনজিও বৈদেশিক সহায়তানির্ভর হওয়ায় অনুদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ও অনুদানের পরিমাণের ওপর প্রকল্পের ধরন ও সময়সীমা অনেকাংশে নির্ভর করে।

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ : বেশির ভাগ এনজিওর (৩৬টি) নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে এবং এসব এনজিও তাদের চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সফলতার গল্প, চাকরির বিজ্ঞপ্তি, পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের পরিচিতি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (১২টি) এনজিওর নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই। তবে তিনটি এনজিওর ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট পরিচালনায় আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। অন্যদিকে যেসব এনজিওর ওয়েবসাইট আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিওর (১৯টি) ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। আবার বাধ্যতামূলক না হলেও তিনটি জাতীয় এনজিও তাদের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী স্বপ্রণোদিতভাবে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করে।

নিয়োগ : বেশির ভাগ এনজিও (৩৮টি) দৈনিক পত্রিকা বা জব-পোর্টালে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও কিছু কিছু নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের নিয়মবহির্ভূত প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ১০টি এনজিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই অস্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতাহীন প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগ করে থাকে। ফলে এসব এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি বিদ্যমান। অন্যদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

কর্মীদের বেতন প্রদান : বেশির ভাগ এনজিও (৪৩টি) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের কর্মীদের বেতন প্রদান করে। অর্থাৎ পাঁচটি এনজিও কর্মীদের, বিশেষ করে মাঠকর্মীদের বেতন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে না দিয়ে নগদ টাকায় প্রদান করে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে বেতন প্রদানে অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের আশঙ্কা রয়েছে। আবার দুটি এনজিওর বিরুদ্ধে বেতন প্রদানে পৃথক দুটি রেজিস্টার ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। এ

ছাড়া দুটি এনজিওতে একই কর্মীকে বিভিন্ন প্রকল্পে শতভাগ হিসেবে দেখানো হলেও একটি প্রকল্প থেকে তার বেতন প্রদান করা হয়।

ক্রয় : বেশির ভাগ এনজিওতে (৪৩টি) কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি এনজিওতে ক্রয়সংক্রান্ত কমিটির অস্তিত্ব নেই। সে ক্ষেত্রে এসব এনজিওতে প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্তে যাবতীয় ক্রয় সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে অধিকাংশ এনজিওতে (৩০টি) ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (১৮টি) এনজিওতে ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। আবার পণ্য সরবরাহকারীদের তালিকা এবং তাদের মধ্য থেকে ক্রয়ের বিধান অনুসরণ করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কৌশল প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী নির্বাচনের প্রবণতা রয়েছে। এ ছাড়া কোনো কোনো এনজিওর বিরুদ্ধে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভুয়া ক্রয়-রসিদ বানিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

অর্থ আত্মসাৎ ও নিয়মবহির্ভূত সুবিধা আদায় : কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে তাদের বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের মোটা অঙ্ক আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কোনো কোনো এনজিওর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশেষ করে প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে তাদের এনজিও থেকে নিয়মবহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। আবার তদারকি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান এবং কর্মসূচি বাজেট থেকে তা পূরণের অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ

কর্মএলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন : দুটি এনজিও দ্বৈততা পরিহারের জন্য তাদের কোনো কোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে অন্যান্য এনজিওর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মএলাকা নির্ধারণ ও উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকে। অন্যদিকে একই উপকারভোগীর আর্থসামাজিক অবস্থান পরিবর্তনকে একাধিক এনজিও কর্তৃক সাফল্য হিসেবে দাবি করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবার একই উপকারভোগীকে পরপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করা সহজ বলে কিছু এনজিও এ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। আবার নিয়ম অনুসারে একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক এনজিওকে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা না করার নির্দেশ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয় না; বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ ও জীবন-জীবিকার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কর্মসূচির ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অধিকাংশ এনজিও (৩২টি) জরিপ কিংবা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপকারভোগী নির্বাচন করে বলে দাবি করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয় প্রভাবশালীদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের কর্মএলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচনের প্রবণতা লক্ষণীয়। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে

বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ক্ষুদ্রঋণ আইন অনুসারে দরিদ্রদের সচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার বিধান থাকলেও তাদের উপেক্ষা করে তুলনামূলক সচ্ছলদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলে কর্মীরা চাপের মুখে পড়েন বলে তারা এ কৌশলের আশ্রয় নেন। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিওর (১৬টি) ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ বা সমস্যা চিহ্নিতকরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদ গঠন : উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিওর পরিচালনা পরিষদে যোগ্যতাসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকলেও অনেক এনজিওর পরিচালনা পরিষদে নামসর্বস্ব সদস্যের সম্পৃক্ততা এবং পরিষদের কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণ না করার প্রবণতা বিদ্যমান। কিছু কিছু এনজিওর পরিচালনা পরিষদে যোগ্যতার তুলনায় প্রধান নির্বাহীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রাধান্য রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্তি : উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিওর (১৪টি) পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। অন্যদিকে বেশির ভাগ এনজিও কমিউনিটি পর্যায়ে তাদের প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি, যদিও এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

পরিচালনা পরিষদে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ : কোনো কোনো এনজিওর পরিচালনা পরিষদে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি থাকলেও পরিষদের কার্যক্রমে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে।

জবাবদিহি

অনুদান প্রদানকারী সংস্থা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি : গবেষণাভুক্ত সব এনজিও অনুদান প্রদানকারী সংস্থা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের কাছে আনুষ্ঠানিক জবাবদিহি প্রকাশ করে। মূলত নিয়মিত পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভায় অগ্রগতি জানানোর মধ্যেই এ জবাবদিহি সীমিত। এ ক্ষেত্রে কিছু সূক্ষ্ম ঘাটতির উদাহরণ রয়েছে। যেমন অনুদান প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও তাদের মূল্যায়নকারী পরামর্শকদের নিয়ে শুধু সফল কর্মএলাকা পরিদর্শন করানোর প্রবণতা। আবার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের দুর্বল দিক বা ঘাটতি উল্লেখ না করে শুধু সাফল্যের দিক অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহি : পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহির বেশ কিছু ভালো দৃষ্টান্ত থাকলেও কোনো কোনো এনজিওতে জবাবদিহির ঘাটতির

অভিযোগ রয়েছে। যেমন নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদনের বিধান থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কোনো সভা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে পরিষদ সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রবণতা রয়েছে।

উপকারভোগীদের কাছে জবাবদিহি : নয়টি এনজিও অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করে। অর্থাৎ বেশির ভাগ এনজিও (৩৯টি) কর্মসূচি পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করে না। এ বিষয়টি নির্দেশ করে যে উপকারভোগীদের কাছে এনজিওদের জবাবদিহি করার চর্চায় ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। তবে একটি ইতিবাচক উদাহরণ হলো, তিনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্প এলাকায় হটলাইন নম্বর ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করেছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা : অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ-বিষয়ক কর্মকর্তা রয়েছেন। অন্যদিকে প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ-বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকায় প্রকল্প বা কর্মসূচি কর্মকর্তা দ্বারা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। আবার বেশির ভাগ এনজিওতে (৩৬টি) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য একটি এনজিও ন্যায়পাল নিয়োগ দিয়েছে।

গবেষণাভুক্ত এনজিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনিয়ম-দুর্নীতি

এনজিওগুলোতে কর্মী নিয়োগে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দেশীয় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় ক্ষমতাশালী, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে মাঠপর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমে অযাচিত প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের একাংশ এনজিওদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া জেলা পর্যায় থেকে সনদ সংগ্রহের সময় নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি ও হয়রানির অভিযোগ রয়েছে জেলা প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে এনজিওর কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় নিয়মবহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পারিবারিক ভ্রমণে গিয়েও স্থানীয় এনজিওর কার্যালয় পরিদর্শনের নামে পরিবহন ও রেস্ট হাউসের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এসব কর্মকর্তার একাংশের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফরম পূরণের নিয়মসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, এমনকি কার্যালয় পরিদর্শনের নামে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে; বিশেষ করে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওর ক্ষেত্রে এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। এমনকি প্রতিবেদন জমা দিয়ে তা নথিভুক্ত করার জন্যও নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এনজিও ব্যুরোর কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া এনজিওর নিবন্ধন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও অর্থ দাবির অভিযোগ রয়েছে এনজিও ব্যুরো এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যরত এনজিওগুলোকে প্রকল্প অনুমোদন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বেশি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ফলে তাদের অন্য এলাকার এনজিওর তুলনায় বেশি হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা ও এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

এনজিও খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের ঘাটতির পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারা; প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে অনিয়ম-দুর্নীতি; দুর্বল পরিচালনা পরিষদ গঠন; তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার ঘাটতি; স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি; উপকারভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি এবং স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ ছাড়াই প্রকল্প প্রণয়ন; স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের অযাচিত প্রভাব; অনুদাননির্ভর প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি। সুশাসনের ঘাটতির কারণে কিছু নেতিবাচক ফলাফল তৈরি হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা; তহবিল অনুমোদনে প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার এবং কর্মসূচির ব্যয় কমানো; প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব ও জবাবদিহির ঘাটতি; নিয়োগ, ক্রয়, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ও অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়

কার্যসম্পাদন; সঠিক কর্মসূচি ও উপকারভোগী নির্বাচন না হওয়া; কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈততা এবং সুশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা। সুশাসনের ঘাটতির কিছু প্রভাবও চিহ্নিত করা যায়। সেগুলো হলো : এনজিও কর্মকাণ্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি; এনজিও খাত সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম হ্রাসের ঝুঁকি এবং তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযাচিত নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের আশঙ্কা।

সারণি ১ : এনজিও খাতে সুশাসনের তুলনামূলক চিত্র : ২০০৭ ও ২০১৭

সূচক	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	আংশিক অগ্রগতি	অপরিবর্তিত
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যসম্পাদন	মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসরণ	কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ	-
	কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়নব্যবস্থার চর্চা		
	জেন্ডার সংবেদনশীলতার নীতি ও চর্চা		
	যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন		
স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার	হিসাব ও নিরীক্ষা তথ্য প্রকাশ	কমিউনিটিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তথ্য প্রদান	হিসাব বিভাগকে প্রভাবিত করা
		ওয়েবপেজে হালনাগাদ তথ্য প্রদান	
		প্রভাবমুক্ত নিরীক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	
প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ	-	যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন	সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব
		পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা	পরিচালনা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী আংশিকভাবে কর্মীদের অবহিত করা
জবাবদিহি	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা	কমিউনিটির কাছে জবাবদিহির চর্চা	পরিচালনা পরিষদের অনিয়মিত সভা এবং শুধু সভায় উপস্থিতিনির্ভর সম্পৃক্ততা
	অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা	দাতা সংস্থার কাছে ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ	

উপসংহার

গত এক দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত এনজিওগুলোতে সুশাসনের কিছু ইতিবাচক চর্চা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে; বিশেষ করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা বা নির্দেশিকা, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণের কিছু ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের চর্চা উল্লেখ করা যায়। যদিও নীতিমালা ও ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতির সুযোগ রয়েছে; বিশেষ করে পরিচালনা পরিষদ ও এনজিও ব্যবস্থাপনার মধ্যে জবাবদিহিমূলক সম্পর্ক জোরদার করা, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ এবং নিয়োগ, ক্রয়, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এনজিওর জবাবদিহির ঘাটতি তৈরির ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশিকায় দুর্বলতা, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে যথাযথ সমন্বয়-পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগে দুর্বলতা, স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের একাংশের অযাচিত প্রভাব, এনজিওর অনুদাননির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মতো প্রতিবন্ধকতা বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসন চর্চায় ঘাটতি তৈরি করছে। এসব প্রতিবন্ধকতার অবসান না ঘটলে এনজিও কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তি ব্যাহত হওয়া এবং এ খাতের গ্রহণযোগ্যতা ও অবদান প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি এর ফলে এনজিও খাতের ওপর তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযাচিত নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

সুপারিশ

গবেষণার উপরিউক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের উন্নয়নে নিচের সুপারিশ পেশ করছে।

এনজিও দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য

১. প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে, বিশেষ করে সেবামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

২. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ– শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে জবাবদিহির যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. একক কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পরিহার– কর্মীদের মতামত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রতিফলন এবং পরিচালনা পরিষদ ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৪. নৈতিক আচরণবিধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রণোদনাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত এবং নাগরিক সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন; এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিধি নির্ধারণসহ 'গভর্নেন্স ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করতে হবে।

৭. পরিচালনা পরিষদের কাছে নির্বাহী ব্যবস্থাপনার কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি বা প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা চালু করতে হবে।

১০. এনজিওর অভ্যন্তরীণ অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এনজিওবিষয়ক ব্যুরো দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য

১১. প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যালয় পরিদর্শনের নামে এবং নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদনের সময় নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে জড়িত এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন ২০১৬-এর বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারার সংস্কার করা এবং বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।

১৩. প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১৪. ভিন্ন ভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই উপকারভোগী নির্বাচন বা দ্বৈততা বন্ধে এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

১৫. এনজিওর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য

১৬. বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, যাতে এনজিওগুলোর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা যায়।

১৭. সংস্থার নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন-প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য

১৮. প্রতিটি প্রকল্পের মধ্যে 'সুশাসন কম্পোনেন্ট' রাখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিওর অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৯. সহযোগী এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার বন্ধ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা দেশীয় বা বৈদেশিক আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত, নিয়োগকৃত জনবল দ্বারা পরিচালিত, যাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত এবং নিজস্ব সম্পদের দিক থেকে সচ্ছল। সাধারণত এনজিও তিন ধরনের– স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বেতনভুক্ত জনবল ছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে; যদিও তারা কোনো না কোনো উন্নয়ন সহযোগী বা এনজিওর অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত এনজিওরা মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সর্বোপরি এনজিও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে (মার্সার, ২০০২)।

[২] মার্সার, 'এনজিও'স, সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড ডেমোক্রেটাইজেশন : আ ক্রিটিক্যাল রিভিউ অব দ্য লিটারেচার', *প্রগ্রেস ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ*, ২০০২, ২.১:৫-২২।

[৩] সাধন কে দাস, 'গভর্নেন্স ইন এনজিও'স : চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৭)।

[৪] সালাউদ্দিন আমিনুজ্জামান ও সুমাইয়া খায়ের, 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসম্যান্ট বাংলাদেশ', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৪); https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/fr_nis_NICSA_14_en.pdf(১৬ মার্চ ২০১৬)।

[৫] http://www.ngoab.gov.bd/site/page/3de95510-5309-4400-97f5-0a362fd0f4e6/সব এনজির তালিকা (২৬ জুলাই ২০১৮)।

[৬] সুশাসন এমন একটি ধারণা যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার একটি ভারসাম্য তৈরি হয়, যাতে যেখানে ক্ষমতা ও সম্পদ একক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কুক্ষিগত না থাকে। স্বেচ্ছাসেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্যের পাশাপাশি উপকারভোগীদের স্বার্থ নিশ্চিত করা জরুরি। সে জন্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[৭] এনজিওর আইনগত বৈধতা হলো সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি কতখানি আইনিগত ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে (এডওয়ার্ডস ১৯৯৯)। এস লিস্টার, 'এনজিও লেজিটিমেসি টেকনিক্যাল ইস্যু অর সোশ্যাল কন্সট্রাক্ট?', *ক্রিটিক অব অ্যান্থ্রপোলজি*, ২০০৩, ২৩.২:১৭৫-১৯২ থেকে গৃহীত।

[৮] এডওয়ার্ডস, ১৯৯৯। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[৯] এডওয়ার্ডস, ১৯৯৯; স্যাক্সবি, ১৯৯৬। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[১০] ইয়াডে, ১৯৯৭; হাডসন, ২০০০; পিয়ার্স, ১৯৯৭। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[১১] এডওয়ার্ডস, ১৯৯৭; ফাউলার, ১৯৯৭; পিয়ার্স, ১৯৯৭; স্যাক্সবি, ১৯৯৭। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[১২] এডওয়ার্ডস, ১৯৯৭; ফাউলার, ১৯৯৭; পিয়ার্স, ১৯৯৭; স্যাক্সবি, ১৯৯৬। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[১৩] লিস্টার, ২০০৩)।

[১৪] স্কট ১৯৯৫। লিস্টার (২০০৩) থেকে গৃহীত।

[১৫] নিয়ন্ত্রণমূলক বৈধতা বলতে এনজিওগুলো রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন, প্রবিধানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মনীতি কতখানি অনুসরণ করে (লিস্টার, ২০০৩)।

[১৬] ব্যবহারিক বৈধতা বলতে প্রতিষ্ঠানের স্বীয়-স্বার্থ ও উপকারভোগীদের চাহিদার ওপর নির্ভরশীলতাকে বোঝায়। সূত্র : লিস্টার, ২০০৩; পি জেপসন, 'গভর্নেন্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি অব এনভায়রনমেনটাল এনজিওস, *এনভায়রনমেনটাল সায়েন্স অ্যান্ড পলিসি*, ২০০৫, ৮.৫: ৫১৫-৫২৪।

[১৭] আদর্শগত বৈধতা হলো প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বা চর্চার মধ্যে সুসমন্বয় (লিস্টার, ২০০৩)।

[১৮] জ্ঞানভিত্তিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মডেল বা উত্তম প্রয়াস অনুসরণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত (লিস্টার, ২০০৩)।

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায় নারীর ভূমিকা, ঝুঁকি ও করণীয়*

শাম্মী লায়লা ইসলাম ও শাহজাদা এম আকরাম

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা– রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির বিস্তার গভীরভাবে ঘটেছে।[১] দুর্নীতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজের সব স্তর, বিশেষ করে ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর' হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে পুরুষের মতো নারীদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। টিআইবির ২০১৫ সালের খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯ দশমিক ৬ শতাংশ কোনো না কোনো সেবা খাত থেকে সেবা নিয়েছেন এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।[২] জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ ছিলেন নারী, যাদের ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন বলে দেখা যায়।[৩] তবে টিআইবির খানা জরিপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নারীর ঘুষ দেওয়ার বা দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হার কম হলেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব কম; বরং তুলনামূলক কম সেবা নেওয়ার কারণে ঘুষ দেওয়ার প্রথম ধাপে (entry point) নারীদের কম দেখা যায়।[৪]

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে তার কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের নারীদের ওপর দুর্নীতির বিভিন্ন প্রভাব চিহ্নিত করছে এবং সে অনুযায়ী করণীয় প্রস্তাব দিয়ে আসছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আইনিভাবে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে

* ২০১৮ সালের ৬ মে টিআইবি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত কার্যপত্র।

দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর ওপর দুর্নীতির বিশেষ ধরনের একটি ঝুঁকি লক্ষ করা যায়–দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের সঙ্গে নারী জড়িয়ে পড়ছেন, নারীকে জড়িত করা হচ্ছে। নারীকে ওই অবৈধ আয় ও সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করা হচ্ছে এবং এই অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং এরই প্রেক্ষাপটে এই কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কার্যপত্রের মূল উদ্দেশ্য নারীর ওপর দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়ের ঝুঁকির বিশ্লেষণ, এই প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোগত প্রভাব চিহ্নিত করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারণে সহায়ক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি।

দুর্নীতির জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

বিভিন্ন গবেষণায় নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায়, দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় তৃণমূল নারীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুর্নীতির ধারণা আড়ালে থেকে যায় এবং প্রায়ই প্রকাশিত হয় না।[৫] নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন বলে দেখা যায়, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত এবং একই সঙ্গে যা নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।[৬] বৈশ্বিক দুর্নীতি জরিপে দেখা যায়, নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করেন, কিন্তু প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী নন।[৭] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটারের ফলাফলে দেখা যায়, নারীরা ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় কম আগ্রহী।[৮]

টিআইবির একটি গবেষণায় বিশদভাবে বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবেশে দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (ধরন, কারণ ও প্রভাব) উঠে এসেছে।[৯] এ গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। গবেষণায় আরও দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা চার ধরনের–দুর্নীতির শিকার, দুর্নীতির সংঘটক, দুর্নীতির মাধ্যম ও দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির নেটওয়ার্কে জীবনযাপনের কারণে নারীর দুর্নীতির পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা দুর্নীতির এ বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখছেন। পুরুষতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামো, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের অভিগম্যতা ও সুশাসনের বিদ্যমান অবস্থার ওপর নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাত যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা দুর্নীতির শিকার হন। এসব খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকেন। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশ সেবা প্রদানের সময় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো খাতে দুর্নীতি সংঘটনে মাধ্যম হিসেবে নারীদের ব্যবহার (যেমন ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর আদায়, যার বিনিময়ে তাদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া) করা হয়। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করেন এবং সার্বিকভাবে শিকার, সংঘটক বা মাধ্যম হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির সুবিধা ভোগ করেন।

গবেষণায় নারীর ওপর দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে মৃত্যু থেকে শুরু করে অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি, প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, দুর্নীতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাহত হওয়া চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈধ উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনসংক্রান্ত আইনি কাঠামো

সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তরের অধিকার হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মৌলিক মানবাধিকার।[১০] বাংলাদেশের সংবিধানেও সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[১১] কিন্তু অবৈধ উপায়ে বা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকে দেশের আইনি কাঠামো কোনোভাবেই সমর্থন করে না। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না।[১২]

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন আইনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আয় বা সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা সম্পদের হিসাব বা ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে বলা রয়েছে। যেমন ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যার করযোগ্য আয় রয়েছে, তাকে আয়কর দিতে হবে এবং রিটার্ন দাখিল করতে হবে।[১৩] আয়কর রিটার্নের সঙ্গে ওই ব্যক্তির এবং তার স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মোট সম্পদ এবং দায়-দেনার বিবরণ এবং কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে

থাকলে তার বিবরণ দাখিল করতে হবে।[১৪] সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বিমা পলিসি ও মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের অলংকারসহ সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা করবেন।[১৫] এ ছাড়া প্রতিবছর প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী দাখিল করারও বিধান রয়েছে।[১৬] একইভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে তার ও তার স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোনের কাছ থেকে পাওয়া বা ধার করা অর্থের পরিমাণ এবং তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কিত তথ্য দাখিল করতে হবে।[১৭] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব চাওয়ার এখতিয়ারও উপরোল্লিখিত আইনগুলোতে দেওয়া হয়েছে।

তবে বিভিন্ন আইনি বাধানিষেধ থাকলেও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা অবৈধভাবে আয় করছে বা সম্পদ অর্জন করছে। আবার সংবিধান মতে, আইনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী সবাই সমান, অর্থাৎ সব আইনই নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য এবং কোনো অপরাধের জন্য নারী ও পুরুষের একই শাস্তির বিধান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ নিজের নামে বা অন্যের নামে সম্পত্তি অর্জনসংক্রান্ত অপরাধ ও সাজার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।[১৮] এ আইন অনুযায়ী কোনো তথ্যের ভিত্তিতে ও প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর যদি দেখা যায় কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বৈধ উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রেখেছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন, তাহলে দুদক ওই ব্যক্তিকে দায়-দায়িত্বের বিবরণ দাখিলসহ অন্য যেকোনো তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবে।[১৯] এ ধরনের আদেশ পাওয়ার পর যদি কেউ সে অনুযায়ী তথ্য দিতে ব্যর্থ হন বা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কোনো তথ্য দেন বা দলিলপত্র উপস্থাপন করেন তাহলে ওই ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।[২০]

একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি নিজ নামে বা তার পক্ষে অন্য কারও নামে এমন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রাখেন বা মালিকানা অর্জন করেন যা অসাধু উপায়ে অর্জিত হয়েছে এবং তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয় এবং তিনি এই সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের কাছে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে ওই ব্যক্তি সর্বনিম্ন তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ওই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।[২১] সাক্ষ্য আইন-১৮৭২ অনুযায়ী কোনো দুষ্কর্মের সহযোগীও ওই অপরাধের জন্য সমানভাবে অপরাধী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হবেন।[২২]

একইভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুযায়ী অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর, অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করার অভিপ্রায়ে কোনো বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা; সম্পৃক্ত অপরাধ থেকে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এ ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা; অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয় এমন কোনো কাজ করা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।[২৩]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুসারে যদি কেউ কোনো অপরাধ সংঘটনে বা অপরাধ বলে গণ্য কোনো কাজে সহায়তা করেন বা যদি ওই অপরাধ বা কার্য দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির মতো একই উদ্দেশ্যে কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য আইনতই যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধে সহায়তা করেন বলে বিবেচিত হবেন।[২৪] এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধে সহায়তা করলে যদি এর ফলে সাহায্যকৃত কাজটি সম্পন্ন হয় তাহলে তা দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।[২৫]

কাজেই দেখা যাচ্ছে নিজ নামে বা অন্য কারও নামে রাখা সম্পদ যদি জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয় বা ওই সম্পদ কীভাবে অর্জিত হলো তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি দেওয়া না হয় এবং এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হলেও জড়িত হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি

বাংলাদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও সম্পদ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় বলে দেখা যায়। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থসম্পদের একটি বিশাল অংশ বিভিন্ন উপায়ে দেশের বাইরে পাচার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ঋণপত্রে আন্ডার/ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার, বিদেশি ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা, মালয়েশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা বা অভিবাসী হিসেবে বিনিয়োগ, বা অফ-শোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচার।[২৬] অন্যদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দেশের ভেতরে বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয় ও সম্পদ ক্রয়ে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের অর্থসম্পদ রক্ষা করা তথা দুর্নীতি করার পর আইনের হাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা দুর্নীতি করে নিজেকে আড়াল করার জন্য দুর্নীতিবাজরা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। এমনই একটি পন্থা হচ্ছে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি নিজের নামে না রেখে পরিবারের অন্য কারও নামে, যেমন স্ত্রী বা সন্তানের নামে বা মা-বাবার নামে করা। আয়কর ফাঁকি দেওয়া বা অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই এভাবে সম্পত্তি রাখেন।

সাধারণভাবে আইনে পরিবারের সদস্যদের নামে সম্পদ ক্রয় বা অর্থ গচ্ছিত রাখায় কোনো বাধা নেই। সম্পদ বৈধ উপায়ে অর্জিত হলে মূল কর্তাব্যক্তি বা যার নামে অর্জিত তার আয়ের উৎস দেখানো প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি ওই অর্থ বা সম্পদ অবৈধ হয় বা আয়ের উৎস অবৈধ হয় বা যথাযথভাবে আয়ের উৎসের ব্যাখা দেওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে ওই অর্থ বা সম্পদ যার নামে তিনিও আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হন। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ অর্থসম্পদ আয় করেছেন এবং নিজেকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করা বা অর্জিত সম্পদ রক্ষা করার জন্য তার স্ত্রীর নামে ওই সম্পত্তি রাখছেন। পরে যখন দুদক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক) এই সম্পদ অর্জনের উৎস বা আয়ের হিসাব জানতে চায় স্ত্রীর কাছে (যেহেতু তার নামেই অর্থ বা সম্পত্তি), তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী সঠিকভাবে জবাব দিতে ব্যর্থ হন এবং আইনি প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হন। এভাবেই কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনরা প্রত্যক্ষভাবে কোনো অপরাধ না করেও অপরাধের ভাগীদার বা অপরাধে সম্পৃক্ত হয়ে যান। দোষী না হয়েও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায় নারীকে নিতে হচ্ছে এবং তাদের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এক দশক ধরে দুদকের বিভিন্ন অনুসন্ধান ও মামলায় এভাবে নারীদের দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত করে ফেলার চিত্র উঠে আসে।

স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জনসংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মামলা

২০০৭-০৮ সালে দেশে ব্যাপক দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালানোর সময় বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত ও মামলায় এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হয়।[২৭] পরবর্তী সময়ে এ ধরনের আরও কয়েকটি মামলায় সংশ্লিষ্ট নারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৮-এর মার্চ পর্যন্ত সময়ে দুদক কর্তৃক দায়ের করা ২৯টি মামলায় ২৯ জন নারীকে স্বামীর দুর্নীতির কাজে সহায়তা বা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন বা সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে অধস্তন আদালত থেকে কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে ২৬টি মামলায় অবৈধ সম্পদ অর্জন বা আয়ের জ্ঞাত উৎসের বাইরে দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীদেরও (যেহেতু স্ত্রীর নামে সম্পদ) স্বামীর দুর্নীতির কাজে সহায়তা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়েছে।

এসব মামলা পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই ২৯ জন নারীর নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ ও সম্পদ রাখা ছিল। এই ২৯ জন নারীর স্বামীদের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় এদের ১৬ জনই (৫৫ দশমিক ২ শতাংশ) রাজনীতিক, যাদের মধ্যে ৪ জন সাবেক মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, ১০ জন সাবেক সাংসদ, একজন সাবেক সাংসদের পুত্র এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সচিব। এ ছাড়া বাকি ১৩ জনের মধ্যে ৬ জন (২১ শতাংশ) সরকারি কর্মকর্তা (দুজন সাবেক সচিব, একজন এনবিআরের সদস্য, একজন এআইজি পুলিশ, একজন প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন সাবেক

প্রধানমন্ত্রীর অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার), তিনজন (১০ দশমিক ৩ শতাংশ) ব্যবসায়ী এবং চারজন (১৪ শতাংশ) অন্যান্য পেশার (চিকিৎসক সংগঠনের নেতা, শ্রমিক নেতা, ব্যাংক কর্মকর্তা)।[২৮]

চিত্র ১ : আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত অবৈধ আয় ও সম্পদ অর্জনকারী নারীদের স্বামীদের পেশা

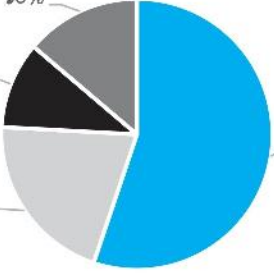

অপরদিকে এদের মধ্যে ২৬ জনকে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন সাজা দেওয়া হয়েছে–২৫ জনকে তিন বছরের এবং একজনকে দুই বছরের সাধারণ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০ জনকে সাধারণ কারাদণ্ডের সঙ্গে অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত। প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রেই অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত।

২০১৫-১৭ সালের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্তমানে দুদকে স্বামী কর্তৃক অবৈধ আয় করে স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জনসংক্রান্ত ১১৮টি অভিযোগ অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে (দুদকের অবৈধ সম্পদসংক্রান্ত অনুসন্ধানাধীন অভিযোগের ১১ শতাংশ), যার মধ্যে ৬১টি অভিযোগ দুদকের বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে (ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম) অনুসন্ধানাধীন অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া ৩০টি মামলা তদন্তাধীন (দুদকের অবৈধ সম্পদসংক্রান্ত তদন্তাধীন অভিযোগের ১২ শতাংশ) ও ১৪টি মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে (দুদকের অবৈধ সম্পদসংক্রান্ত চার্জশিটের প্রায় ৩০ শতাংশ) (সারণি ১)।

সারণি ১ : ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দুদক কর্তৃক পরিচালিত স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জনসংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মামলা[২৯]

মামলার পর্যায়	অনুসন্ধান	তদন্তাধীন মামলা	চার্জশিটকৃত মামলা
সংখ্যা	১১৮	৩০	১৪

এই ১১৮টি অনুসন্ধানাধীন অভিযোগের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে ১২টি, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে ৫১টি। অন্যদিকে ৪৫টি অভিযোগ দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই সম্পর্কিত। এ ছাড়া চারটি অভিযোগ অন্যান্য ধরনের এবং ছয়টি অভিযোগের ধরন জানা যায়নি। এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ৫৮ জনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারী। এ ছাড়া চারজন রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধি, দুজন ব্যবসায়ী ও পাঁচজন অন্যান্য পেশাজীবী (ব্যাংকার, আইনজীবী); ৪৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা জানা সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে ৩০টি তদন্তাধীন মামলার মধ্যে ২৭টির ক্ষেত্রে অভিযোগ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন। বাকি তিনটি অবৈধ সম্পদ অর্জন, তথ্য গোপন এবং মিথ্যা সম্পদ বিবরণ দাখিলের অভিযোগ। মামলাগুলোয় অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ১৪ জনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারী। এ ছাড়া চারজন রাজনীতিক, দুজন ব্যবসায়ী, দুজন অন্যান্য পেশাজীবী (ব্যাংকার, আইনজীবী); আটজন অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা জানা সম্ভব হয়নি।

চিত্র ২ : স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জনসংক্রান্ত বর্তমান অনুসন্ধান ও মামলা : স্বামীদের পেশা

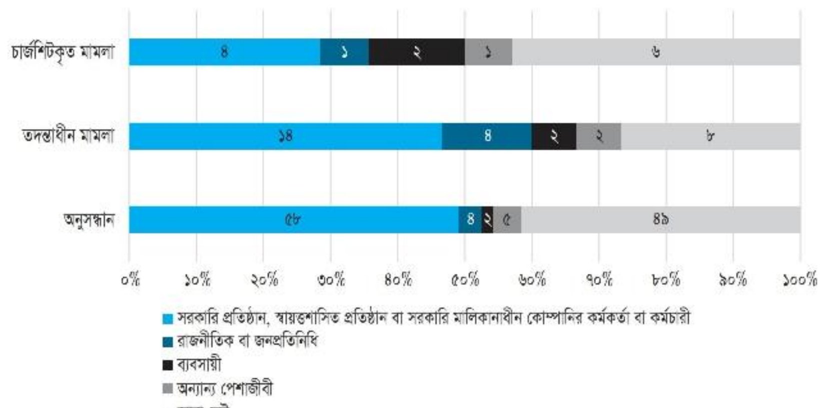

একইভাবে চার্জশিট দাখিল হয়েছে এমন ১৪টি মামলার ক্ষেত্রে ১১টি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, একটি অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং দুটি নির্ধারিত সময়ে বা সম্পদ বিবরণ দাখিল না করাসংক্রান্ত অভিযোগ। এ ছাড়া এসব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর

পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে চারজনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী, একজন রাজনীতিক, দুজন ব্যবসায়ী, একজন অন্যান্য পেশাজীবী; ছয়জন অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা জানা সম্ভব হয়নি।

এ ধরনের মামলাসংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায়, ২০০৭-০৮ সালে সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বেশির ভাগ ছিলেন রাজনীতিকের স্ত্রী, যেহেতু ওই সময় দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা। পরবর্তী সময়ে পরিচালিত অনুসন্ধান, মামলা ও তদন্তের আওতায় বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বলে দেখা যায়; যার একটি বড় অংশই বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী।

দুদক থেকে জানা যায়, এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির মামলা হলে তদন্তের সময় স্বভাবতই যার (এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির স্ত্রী) সম্পদ তার কাছে সম্পদের বিবরণী বা হিসাব বা ব্যাখা চাওয়া হয়, বিশেষ করে সেই নারীকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে পড়তে হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা হয়তো জানেই না যে তাদের নামে অর্থ বা সম্পদ রয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী এ-সম্পর্কে জানেন এবং তার সম্মতি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কে না জানার কারণে বা সেসব অর্থ বা সম্পদের বৈধ ও হালনাগাদ কাগজপত্র ও তথ্য না থাকার কারণে ওই নারী যথাযথভাবে সম্পদের বিবরণী বা হিসাব বা ব্যাখ্যা দাখিল করতে ব্যর্থ হন এবং নিরুপায় হয়ে মিথ্যা বিবরণী দাখিল করেন।[৩০] এর ফলে তাকেও তার স্বামীর সঙ্গে মামলার আসামি করা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীকে রক্ষা করার বদলে স্বামী নিজেকে বাঁচাতে দাবি করেন যে স্ত্রীর সম্পদের হিসাব তিনি জানেন না। অপরদিকে স্ত্রী যদি অস্বীকারও করেন যে তিনি তার নামে রাখা সম্পদ সম্পর্কে কিছু জানেন না, তারপরও তিনি সহযোগী হিসেবে মামলার আসামি হয়ে যান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর নামে অবৈধ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার ফলাফল না বুঝেই নারীরা বিপদে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীদের নামে লোক দেখানো 'ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর'ও (টিআইএন) খোলা হয়, যেখানে আয়ের উৎস হিসেবে এমন ব্যবসার উল্লেখ করা হয় যা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না, যেমন মৎস্য ব্যবসা, 'রাখি মালের' ব্যবসা।[৩১]

তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, স্বামী যে উদ্দেশ্যে (নিজেকে ও সম্পদ রক্ষার্থে) স্ত্রীর নামে সম্পদ বা অর্থ রাখে তা পূরণ হয় না, কারণ তদন্তে দেখা যায় স্ত্রীর নামে সম্পদ কেনা হলেও টাকা পরিশোধ হয়েছে স্বামীর ব্যাংক হিসাব থেকে। এ ধরনের দুর্নীতির মামলাগুলোতে স্বামীকেই প্রধান আসামি করা হয়, স্ত্রীকে সহায়তাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সম্পদ বা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : দায় কি শুধু নারীর?

ওপরের তথ্য পর্যালোচনা করলে বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়, যেমন নারীরা এ ধরনের ঝুঁকিতে কেন পড়ছেন? এ ধরনের দুর্নীতি কি নারীর অজান্তে হয়, নাকি নারীদের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই তাদের নামে সম্পদ করা হয়? নারীরাও কি এর সুবিধাভোগী? দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ধরা পড়লে কী পরিণাম হবে সে সম্পর্কে নারীদের কি কোনো ধারণা নেই? স্বামীদের দুর্নীতি প্রতিরোধে স্ত্রীরা কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একটি পরিবারের প্রধান পুরুষ ব্যক্তি বা স্বামীই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, সেখানে নারী বা স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং/অথবা স্বামীকে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ পরিবারের কোনো সদস্যের নামে রাখাই যুক্তিসংগত, আর এর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছেন স্ত্রীরা, যারা সাধারণত কোনো প্রশ্ন ছাড়াই স্বামীর নির্দেশমতো কাজ করেন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে স্বামীদের প্রতি নারীদের সহমর্মী মনোভাবও কাজ করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বাঁচাতে বা পরিবারের কল্যাণের কথা ভেবে অবৈধ সম্পদের দায়ভার কাঁধে নেন। এমনকি দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ ধরনের সম্পদ তাদের নয় বলে জানালেও আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অনেকেই অপারগ হন। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ বা সম্পদের দায় স্বীকার না করলে নারী (স্বামী কর্তৃক) শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এসব ক্ষেত্রে নারীদের দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীরা নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করেন যে তার নামে সম্পদ বা অর্থ রাখা হোক। এ ধরনের সম্পদ গোপন করার ক্ষেত্রে নারীরা তাদের স্বামীদের সহায়তা করেন। এভাবে স্বামীদের পাশাপাশি স্ত্রীদেরও দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা দেখা যায়।

চিত্র ৩ : দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি : কারণ-ফলাফল-প্রভাব

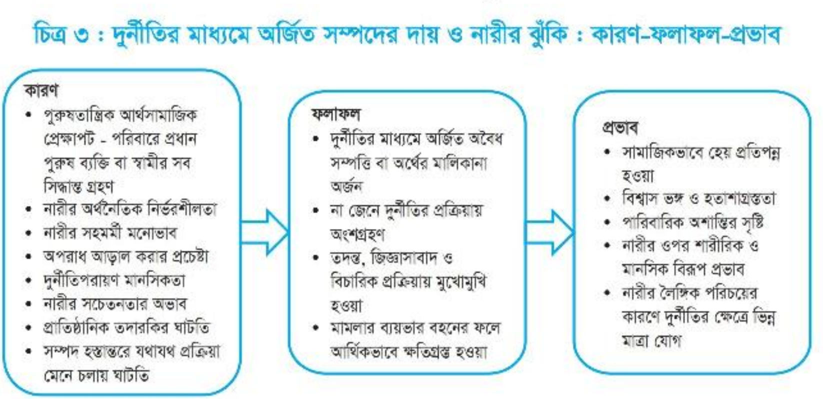

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কোনো কোনো ঘাটতি এ ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেন। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-তে প্রতিবছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের হিসাব দাখিল করার যে বিধি আছে তা মানা হয় না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উদ্যোগও নেওয়া হয় না।[৩২] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তদারকিরও ঘাটতি রয়েছে, যেমন নারীদের নামে সম্পদ ও অর্থ গচ্ছিত রাখার সময় সম্পদের উৎস সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট খোঁজখবর নেয় না বা তার সুযোগ নেই।

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় : নারীর ওপর প্রভাব

দেখা যায় নারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বা অর্থের মালিকানা অর্জন করেন, জেনে বা না জেনে দুর্নীতির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন এবং তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া ও মামলার ব্যয়ভার বহনের ফলে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। অন্তঃপুরবাসিনী নারী হঠাৎই কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে কোনো অবৈধ উপার্জন না করে বা কোনো অপরাধ না করেও আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হয়। নারীর ওপর এসব পরিস্থিতির নানা বিরূপ প্রভাব পড়ে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় পারিবারিক সম্পর্কের ওপর নারীর বিশ্বাস ও আস্থা ভঙ্গ হয়, তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, পারিবারিকভাবে অশান্তির মধ্যে পড়তে হয়। ফলে নারী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতার আরেকটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়।

উপসংহার ও সুপারিশ

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের পারিবারিক দায় নারীর দিক থেকে ভিন্ন ধরনের একটি অভিজ্ঞতা। দুর্নীতির মাধ্যম অর্জিত আয় ও সম্পদের দায় নারীর ওপর ভিন্ন একধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। দেখা যাচ্ছে নারী বিভিন্ন ভূমিকায় এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন। দুর্নীতির শিকার হিসেবে স্বামীর দুর্নীতির দায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন; দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে নারীকে ব্যবহার করে অবৈধ আয় ও সম্পদ গোপন করা হচ্ছে; দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে নারী অর্জিত অবৈধ আয়ের মালিকানা অর্জন করছেন এবং দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে সার্বিকভাবে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তাকারী হিসেবে নারী ভূমিকা পালন করছেন। এই প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

এ ধরনের বাস্তবতার কারণে নারীরা যে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন তা থেকে উত্তরণে টিআইবি নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

১. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদের সজাগ ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালাতে হবে। এই প্রচারণার মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের শাস্তি সম্পর্কে জানাতে হবে।

২. কোনো নারীর নামে কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখা বা সম্পদ ক্রয় করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ওই অর্থ বা সম্পদের উৎস এবং বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৩. পুরুষের দুর্নীতি সম্পর্কে নারীকে সোচ্চার হতে হবে।

৪. নারী অধিকার সংগঠন কর্তৃক দুর্নীতির শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. নারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবেদনশীল হতে হবে এবং আরও নারীবান্ধব ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের যে দায় নারীকে বহন করতে হচ্ছে তার সঙ্গে নারীরা কতখানি সজ্ঞানে জড়িত তা নিরূপণে আরও গবেষণা ও নীতিকাঠামো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

৭. সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণী দানসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সম্পদ ক্রয় ও হস্তান্তরের যথাযথ আইনি-প্রক্রিয়াসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] টিআই-এর 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৭' অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ২৮, যার অর্থ বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। ২০১৬ সালে এই স্কোর ছিল ২৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.transparency.org/cpi2017#results-table (১৭ এপ্রিল ২০১৮)। অন্যদিকে টিআইবির 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫' অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ ps://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4988-corruption-in-service-sectors-national-household-survey-2015(১৭ এপ্রিল ২০১৮)।

[২] টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ* ২০১৫ (বর্ধিত সারসংক্ষেপ), (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৬)।

[৩] উল্লেখ্য, টিআইবির ২০১২ সালের খানা জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ ছিল নারী, যাদের ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ* ২০১২ (সারসংক্ষেপ), https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/es_hhs_hhs2012_12_bn.pdf(২৮ এপ্রিল ২০১৮)।

[৪] জরিপে দেখা যায়, সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার, যেখানে কোনো কোনো খাত যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির

শিকার হয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ প্রতিবেদনের বর্ধিত সারসংক্ষেপ (২০১৬), https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2016/ pub_es_nhhs15_16_bn.pdf(২৮ এপ্রিল ২০১৮)।

[৫] নিয়ারাজো মুতোনহরি, 'হোয়াট স্টপস উইমেন রিপোর্টিং করাপশন?' www.blog.transparency.org (২১ নভেম্বর ২০১২); এন হোসেন, সেলেস্টি নিয়ামু মুসেম্বি ও জেসিকা হিউজ, করাপশন, অ্যাকাউন্টিবিলিটি অ্যান্ড জেন্ডার : আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কানেকশনস, ইউএনডিপি ও ইউনিফেম, ২০১২।

[৬] ইউএনডিপি, সিয়িং বিয়ন্ড দ্য স্টেট : গ্রাসরুটস উইমেনস পারসপেক্টিভ অন করাপশন অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন, (নিউইয়র্ক : ইউএনডিপি, ২০১২); নিয়ারাজো মুতোনহরি, ২০১২।

[৭] ফারজানা নওয়াজ, স্টেট অব রিসার্চ অন জেন্ডার অ্যান্ড করাপশন, ইউফোর এক্সপার্ট অ্যানসার, ইউফোর অ্যান্টি-করাপশন রিসোর্স সেন্টার, ২০০৯,http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption(২৮ এপ্রিল ২০১৮)।

[৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, জেন্ডার, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড করাপশন : হোয়াট আর দ্য লিংকেজেস?, পলিসি পেপার # ১, বার্লিন : টিআই, এপ্রিল ২০১৪।

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_01_2014_gender_ equality_and_corruption_what_are_the_linkage(৮ নভেম্বর ২০১৬)।

[৯] টিআইবি, 'নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি : বাংলাদেশের দুটি ইউনিয়নের চিত্র', ঢাকা, ২০১৫।

[১০] *জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা*, অনুচ্ছেদ ১৭। বিস্তারিত দেখুন :

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৪২। বিস্তারিত দেখুন :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=367(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২০(২)।

[১৩] *আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, ধারা ৭(২) ও ৭৫। বিস্তারিত দেখুন :

http://nbr.gov.bd/uploads/acts/25.pdf(২৪ এপ্রিল ২০১৮)।

[১৪] *আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, ধারা ৮০।

[১৫] *সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা* ১৯৭৯, বিধি ১৩-১৪। বিস্তারিত দেখুন :

http://www2.mopa.gov.bd/images/actsrules/File-16.pdf(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১৬] *প্রাগুক্ত*।

[১৭] *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ* ১৯৭২, ধারা ৪৪(কক)(১)। বিস্তারিত দেখুন :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=424&sections_id=18890(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১৮] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৬ ও ২৭। বিস্তারিত দেখুন :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=914&vol=36&search=2004(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১৯] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৬।

[২০] *প্রাগুক্ত*।

[২১] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৭।

[২২] *সাক্ষ্য আইন*, ১৮৭২, ধারা ১৩৩। বিস্তারিত দেখুন :
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=24&vol=1&search=1872(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[২৩] *মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন*, ২০১২, ধারা ২ (ফ)। বিস্তারিত দেখুন :
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1083&vol=52&search=2012(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[২৪] *বাংলাদেশ দণ্ডবিধি* ১৮৬০, ধারা ১০৮। বিস্তারিত দেখুন :
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=11&vol=1(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[২৫] *বাংলাদেশ দণ্ডবিধি* ১৮৬০, ধারা ১০৯।

[২৬] গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন ডলার। সূত্র : *দ্য ডেইলি স্টার*, ৩ মে ২০১৭। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, ২০১৭, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ', https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/Sustainable_Development_Goal_16/SDG_Ex_Sum_Bangla_170917.pdf।

[২৭] দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৯, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮*, ঢাকা।

[২৮] দুদক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮*; দুদক থেকে প্রাপ্ত তথ্য (এপ্রিল ২০১৮); *প্রথম আলো*, ৩০ মার্চ ২০১৮।

[২৯] দুদক থেকে প্রাপ্ত তথ্য (এপ্রিল ২০১৮) অনুযায়ী। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দুদকের সম্পদসংক্রান্ত মোট অনুসন্ধান ছিল ১ হাজার ৬৫টি এবং অবৈধ সম্পদসংক্রান্ত তদন্তের মোট সংখ্যা ছিল ২৪২টি। সূত্র : দুদক, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৭, পৃ. ২৪-২৯।

[৩০] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'রানাস মাদার জেইলড ফর ৬ ইয়ারস ফর অ্যামাসিং ওয়েলথ ইললিগ্যালি', ২৯ মার্চ ২০১৮; বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/country/rana-plaza-owners-mother-morzina-begum-jailed-for-6-years-1555207।

[৩১] এ ধরনের ব্যবসায় সাধারণত মৌসুমি বিভিন্ন অপচনশীল দ্রব্য যেমন পেঁয়াজ, রসুন, চাল ইত্যাদি কিনে সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং পরে উপযুক্ত সময়ে দাম বাড়ার পর বিক্রি করে দেওয়া হয়।

[৩২] টিআইবি, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ', ঢাকা,২০১৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত ও প্রতিষ্ঠান

সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭*

মো. ওয়াহিদ আলম, ফারহানা রহমান, মোহাম্মদ নূরে আলম
মো. জুলকারনাইন, কুমার বিশ্বজিত দাশ ও নাজমুল হুদা মিনা

প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রেও দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসনব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে; যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। এসব দুর্নীতির যোগসাজশ দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক উভয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত এসব দুর্নীতিকে বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অপরদিকে, সেবা গ্রহণকারীরা বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকালে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। কোনো সেবা গ্রহণকালে সেবার মূল্যের সঙ্গে ছোট অঙ্কের আর্থিক লেনদেন এ পর্যায়ে এ দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এ ধরনের দুর্নীতি ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। এই জরিপে এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেবা খাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর আটটি খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এ খানা জরিপ অষ্টম জরিপ। ২০১৭-এর জানুয়ারি

---

* ২০১৮ সালের ৩০ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত জরিপের সারসংক্ষেপ।

থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে।

জরিপের যৌক্তিকতা

সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়েছে। এ ছাড়া, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, এই জরিপ সরকার, ক্ষমতাসীন জোট, রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ হতে এ জরিপ ভূমিকা পালন করবে।

অপরদিকে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য ১৬.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সব পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে দুর্নীতিবিষয়ক একমাত্র খানা জরিপ হিসেবে টিআইবির এ খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবা খাতে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরবে, যা এসডিজির এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করবে।

জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো –

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কি না, তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- খানার আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

জরিপের আওতা

এই জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবা খাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার এবং বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ক্ষুদ্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৫টি প্রধান সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যেসব খাত থেকে সেবা গ্রহণের হার ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমিসেবা, কৃষি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা ও গ্যাস। উপরিউক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশন, ওয়াসা, ডাক বিভাগ, বিটিসিএল, বিআরডিবি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত সেবা।

জরিপপদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারা দেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে আইএমপিএস থেকে ৮টি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিভাজনে ১৬টি স্তরের বিবেচনায় প্রতিটির স্তরে নির্দিষ্টসংখ্যক গ্রাম ও মহল্লা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্তরের মোট জনসংখ্যার স্কয়ার রুট ট্রান্সফর্মেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে বের করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০টি খানাসংবলিত এক বা একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে, গুচ্ছগুলো থেকে ১০০ খানাসংবলিত একটি গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত গুচ্ছ থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নিচের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ ভুলের সীমা (Margin of Error) বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৭৮ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫ শতাংশ কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালে স্যাম্পল ভ্যারিয়েটের মান)

e= ৫% (স্তরভিত্তিক ভুলের সীমা)

ডিজাইন এফেক্ট = ১.৫ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের ডিজাইন এফেক্ট)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫০৩, যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮ হাহার ৫৫। তবে, ২০১৫ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটিসীমা নিশ্চিত করতে, ২০১৭ সালে ২০১৫ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৪০ রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৫ শতাংশ খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলে নমুনার সংখ্যা ১০ হাজার ২৯৬ এবং শহরাঞ্চলে ৫ হাজার ৫৪৪। জরিপকালে ২৫৯টি খানা অনুপস্থিত থাকায় বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৫৮১টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

চিত্র ১. : একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

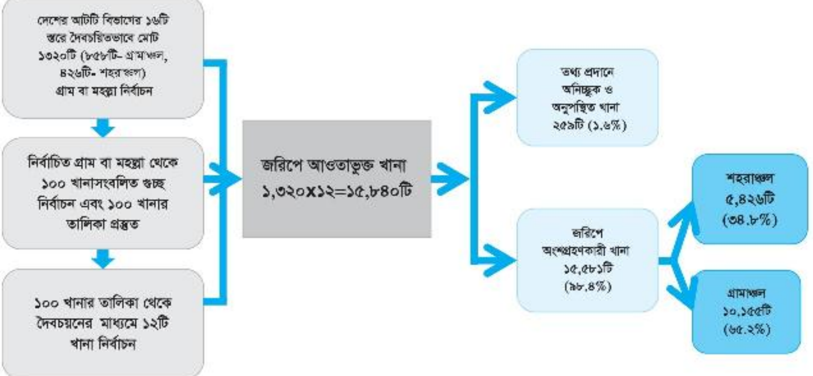

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১০ হাজার ১৫৫টি (৬৫ দশমিক ২ শতাংশ) ও ৫ হাজার ৪২৬টি (৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ)। এসব খানা ৬৪টি জেলাসংশ্লিষ্ট ১ হাজার ৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (গ্রামাঞ্চলে ৮৫৮টি, শহরাঞ্চলে ৪৬২টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এই জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদণ্ড নিশ্চিত করে।

এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক, যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা (Margin of Error) যথাক্রমে পাওয়া গেছে ±১.৭% ও ±১.৮%।

সারণি ১ : জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৯০৩	১,২০৬	৩,১০৯
চট্টগ্রাম	১,৫৩৪	৯৮১	২,৫১৫
রাজশাহী	১,৪১৩	৭৩৬	২,১৪৯
খুলনা	১,২৬২	৬৮৭	১,৯৪৯
বরিশাল	৮৫৬	৪৫১	১,৩০৭
রংপুর	১,২৮৮	৬৮৮	১,৯৭৬
সিলেট	৮৭৬	৪৭৭	১,৩৫৩
ময়মনসিংহ	১,০২৩	২০০	১,২২৩
মোট খানা	**১০,১৫৫**	**৫,৪২৬**	**১৫,৫৮১**

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৮০ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বাছাই-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের ১১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। খসড়া প্রশ্নমালার ওপর ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা এবং টিআইবির গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর জরিপের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়। মাঠপর্যায়ে জরিপের জন্য একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়। টিআইবির একজন গবেষককেও এ ক্ষেত্রে দলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মাঠপর্যায়ে সমস্যা সমাধানে

নিয়োজিত করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolbox App-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়।

প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ, সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। জরিপকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে। টিআইবির গবেষক ও মাঠ তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৪০ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ১৮ দশমিক শূন্য, ব্যাক চেক ১১ দশমিক ৬ শতাংশ, স্পট চেক ১১ দশমিক ৫ শতাংশ, টেলিফোন চেক ২ দশমিক ৬ শতাংশ)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা হলেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ কে এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। এই পরামর্শক দল গবেষণার ধারণা প্রস্তুত থেকে ফলাফল উপস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেন।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় টেলিফোন চেক করা হয়েছে। অবশেষে তথ্য এসপিএসএস ও এসটিএটিএ ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি জটিল জরিপ কার্য বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্তভাবে ডিজাইন বেজড প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর[১] ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এ ছাড়া জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[২] তা ছাড়া প্রাক্কলনের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড এরর (এসই)[৩]-এর মান বের করা হয়।

খানার আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে করে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ জরিপে নারী ও পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৮ ও ৫১ দশমিক ২ শতাংশ এবং খানার গড় সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ৪৬ জন।[৪] জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা প্রধানের ৮৯ দশমিক ৫ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৯ দশমিক ২ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ১ দশমিক ৩ শতাংশ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। জরিপে ৯৮

দশমিক ৯ শতাংশ খানা প্রধান বাঙালি এবং বাকি ১ দশমিক ১ শতাংশ খানা প্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৫] ১৭ দশমিক শূন্য শতাংশ খানা প্রধানের পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা প্রধানের পেশা বেসরকারি চাকরি, ১১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা প্রধানের পেশা কৃষিকর্ম বা মৎস্য চাষ, ৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা প্রধান পরিবহনশ্রমিক এবং ৮ শতাংশ খানা প্রধান দিনমজুর বা ক্ষেতমজুর। জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ১৭ হাজার ৮৫৬ টাকা এবং ব্যয় ১৫ হাজার ৫০৭ টাকা।[৬] জরিপ থেকে প্রাপ্ত এসব তথ্য বাংলাদেশের জনমিতি ও আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা জরিপের প্রতিনিধিত্বশীলতা নির্দেশ করে।

সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

২০১৭-এর খানা জরিপে দেখা যায়, সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ কোনো না কোনো খাত থেকে সেবা নিয়েছে এবং সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে, তাদের ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাসপোর্ট (৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ) ও বিআরটিএ (৬৫ দশমিক ৪ শতাংশ)। বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ, ৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ, ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ২ : বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

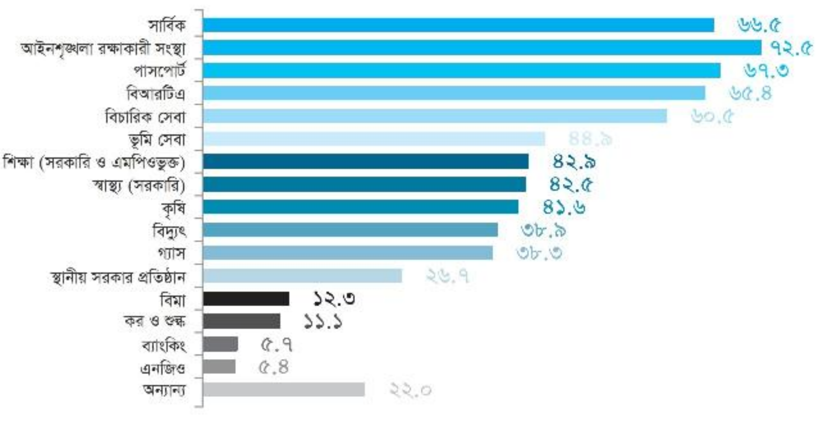

দুর্নীতির ধরন

সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া খানাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে অনীহা (৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ) এবং অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার (৬ দশমিক ৯ শতাংশ) হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

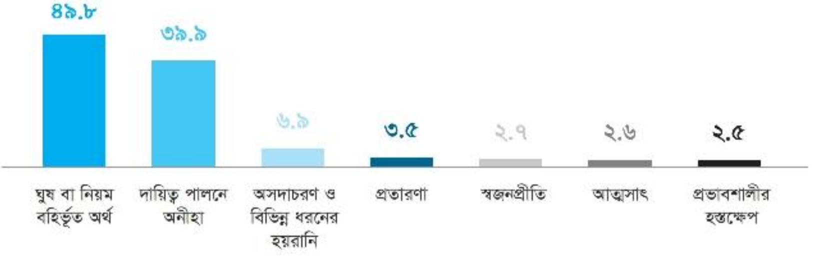

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ২)।

আরও দেখা যায়, বিআরটিএ সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৬৩ দশমিক ১ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং পাসপোর্ট, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ ও ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ৫ হাজার ৯৩০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ গ্যাসসেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ৩৩ হাজার ৮০৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এরপরে আছে বিচারিক ও বিমা সেবা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো গড়ে যথাক্রমে ১৬ হাজার ৩১৪ টাকা ও ১৪ হাজার ৮৬৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে মাথাপিছু প্রাক্কলিত গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬৫৮ টাকা।

সারণি ২ : বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার ও পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
	সার্বিক	৪৯.৮	৫,৯৩০
১	বিআরটিএ	৬৩.১	৬,৩১৮
২	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬০.৭	৬,৯৭২
৩	পাসপোর্ট	৫৯.৩	২,৮৮১
৪	ভূমিসেবা	৩৭.৯	১১,৪৫৮
৫	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.১	৭১৪
৬	বিচারিক সেবা	৩২.৮	১৬,৩১৪
৭	কৃষি	৩০.৫	৪৮৪
৮	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.৮	৪৯৮
৯	বিদ্যুৎ	১৮.৬	৩,০৩২
১০	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৮.৩	৯০৭
১১	গ্যাস	১১.৯	৩৩,৮০৫
১২	কর ও শুল্ক	৯.৪	৫,২১৩
১৩	ডবমা	৪.৯	১৪,৮৬৫
১৪	এনজিও	১.৫	১,৫৮৯
১৫	ব্যাংকিং	১.১	৩,৯৮৫
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৫.৭	৫,০৯২

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

জরিপে বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে।

চিত্র ৪ : ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)

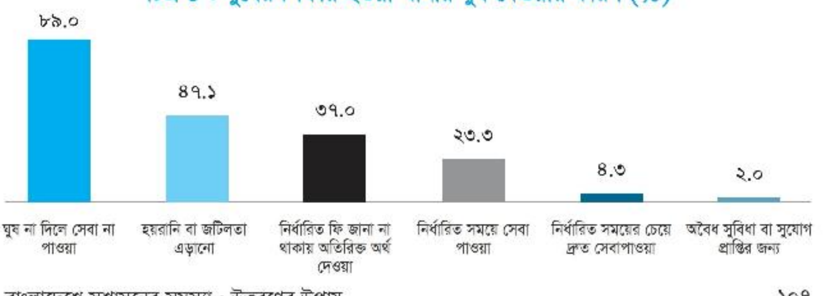

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮৯ শতাংশ খানা ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ খানা হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো, ৩৭ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় এবং ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের গণশুমারির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লাখ ১৪ হাজার ৩০০। এই হিসাবে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সময়কালে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলিত পরিমাণ ১০ হাজার ৬৮৮ দশমিক ৯ কোটি টাকা (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ

সেবা খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
ভূমি প্রশাসন	২,৫১২.৯
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২,১৬৬.৯
বিচারিক সেবা	১,২৪১.৯
বিদ্যুৎসেবা	৯১৪.১
বিআরটিএ	৭১০.২
গ্যাস	৫২৮.১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২
পাসপোর্ট	৪৫১.৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩৮.৭
স্বাস্থ্য	১৬০.২
কর ও শুল্ক	১২৩.৮
ব্যাংকিং	১১২.৯
কৃষি	৫১.০
এনজিও	৩৬.৪
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৩৭৫.১
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	১০,৬৮৮.৯

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের এ পরিমাণ ২০১৫ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১ হাজার ৮৬৭ দশমিক ১ (২১ দশমিক ২ শতাংশ) কোটি টাকা বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির[৭] শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের[৮] ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সব সেবা খাতের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

দুর্নীতি ও অনিয়ম : অবস্থান, খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের খানার তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৮ দশমিক ৪ শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৬৫ দশমিক শূন্য শতাংশ। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে খানার ৫৪ দশমিক শূন্য শতাংশ সেবা খাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

চিত্র ৫: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

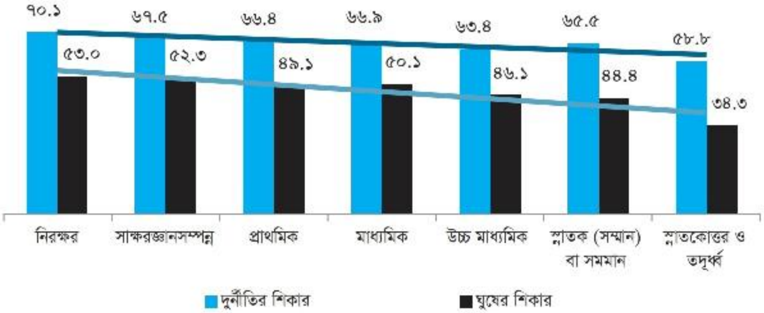

জরিপে খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষণীয়, উচ্চ শিক্ষিত খানাপ্রধানের তুলনায় নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত খানাপ্রধানের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব, সেসব খানার দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ। অপরদিকে যেসব খানার খানাপ্রধান নিরক্ষর, সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৭০ দশমিক ১ শতাংশ ও

৫৩ শতাংশ এবং স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ ও ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ (চিত্র ৫)।

খানা প্রধানের পেশার ক্ষেত্রে চাকরিজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় সাধারণ পেশার জনগণ (কৃষি বা মৎস্যচাষি, জেলে, পরিবহন শ্রমিক, ইত্যাদি) তুলনামূলক দুর্নীতির শিকার বেশি হয় (চিত্র ৬)। যেসব খানাপ্রধানের পেশা কৃষিকর্ম বা মৎস্য চাষ, সেসব খানার ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো খাত থেকে সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, জেলে পেশার খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে এ হার ৭৫ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে যেসব খানাপ্রধান পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার), বেসরকারি চাকরি এবং সরকারি চাকরি তাদের খানাগুলোর যথাক্রমে ৫৯ দশমিক ৯ শতাংশ, ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৬ : খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

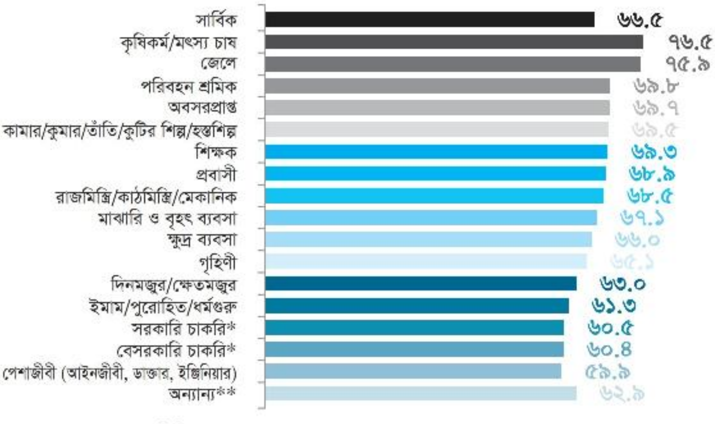

* শিক্ষক ও পেশাজীবী বাদে

** দর্জি, রিকশা-ভ্যানচালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১ শতাংশ ও ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়। আয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি (চিত্র ৭)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার টাকার নিচে, সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট বার্ষিক আয়ের ২ দশমিক ৪১ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় ৬৪ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব

তাদের মোট বার্ষিক আয়ের শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ ঘুষ হিসেবে ব্যয় করে; অর্থাৎ ৬৪ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়ের শ্রেণির খানার ঘুষের বোঝার তুলনায় ১৬ হাজার টাকার কম আয়ের খানাগুলোর ঘুষের বোঝা ২০ দশমিক ১ গুণ বেশি।

চিত্র ৭ : আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

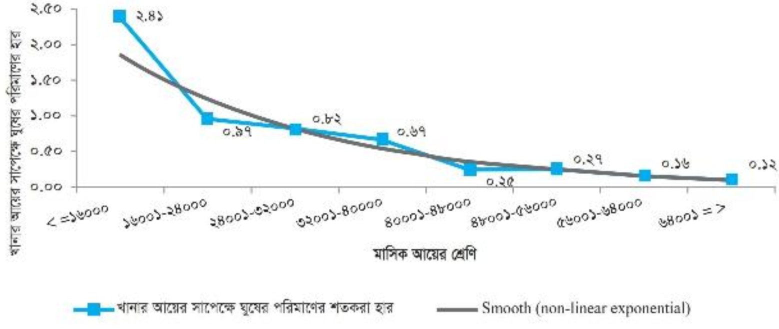

খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি

জরিপে সেবা গ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। জরিপে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ নারী এবং ৫৪ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বিদ্যুৎ, কৃষি এবং কর ও শুল্ক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। তবে স্থানীয় সরকার, বিমা, গ্যাস, পাসপোর্ট ও বিচারিক সেবা খাতে নারী সেবাগ্রহণকারী পুরুষ সেবাগ্রহণকারীর তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

চিত্র ৮ : খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)

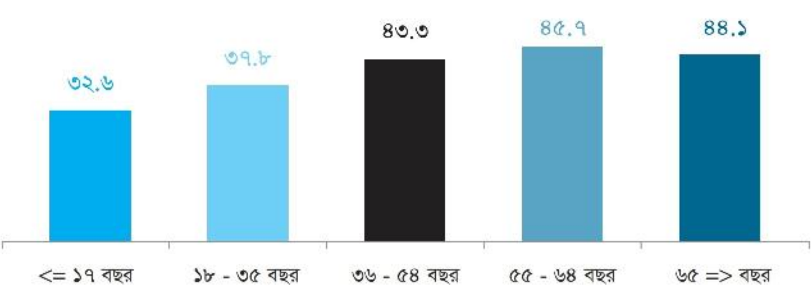

খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহণকারীদের তুলনায় ৩৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহণকারী অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। ১৭ বছর বা তার কম বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার ৫৫-৬৪ বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহণকারীর ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ (চিত্র ৮)।

সারণি ৪ : বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১৭-এর জরিপের তুলনা)*

খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১৫	২০১৭
সার্বিক	৬৭.৮	৬৬.৫
গ্যাস	১১.৯	৩৮.৩ ↑
কৃষি	২৫.৮	৪১.৬ ↑
বিচারিক সেবা	৪৮.২	৬০.৫ ↑
বিদ্যুৎ	৩১.৯	৩৮.৯ ↑
বিআরটিএ	৬০.১	৬৫.৪ ↑
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৭.৫	৪২.৫ ↑
বিমা	৭.৮	১২.৩ ↑
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩.০	৫.৪ ↑
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬০.৮	৪২.৯ ↑
পাসপোর্ট	৭৭.৭	৬৭.৩ ↓
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.১	২৬.৭ ↓
ভূমিসেবা	৫৩.৪	৪৪.৯ ↓
কর ও শুল্ক	১৮.১	১১.১ ↓
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৬	৭২.৫ ↓
ব্যাংকিং	৫.৩	৫.৭
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১৭.১	২২.০ ↑

** ২০১৫ ও ২০১৭-এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী ↑ চিহ্ন দিয়ে বৃদ্ধি এবং ↓ চিহ্ন দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে।*

খাতভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র : ২০১৫-২০১৭

২০১৫ সালে বিভিন্ন খাত থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়, যার মাত্রা ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ (সারণি ৪)। ২০১৭-এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১৫ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১৫-এর তুলনায় ২০১৭ সালে গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, বিআরটিএ, স্বাস্থ্য, বিমা, এনজিও ও অন্যান্য সেবায় দুর্নীতি বেড়েছে এবং শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কর ও শুল্ক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় দুর্নীতি কিছুটা কমেছে। ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির মাত্রা অপরিবর্তিত আছে।

সারণি ৫ : বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৫ ও ২০১৭ এর জরিপের তুলনা)*

খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১৫	২০১৭
সার্বিক	**৫৮.১**	**৪৯.৮** ↓
কৃষি	১৮.২	৩০.৫ ↑
বিআরটিএ	৫২.৩	৬৩.১ ↑
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৩২.৮ ↑
বিমা	১.৮	৪.৯ ↑
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৬.৭	১৯.৮ ↑
গ্যাস	১০.৬	১১.৯ ↑
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.০	১.৫ ↑
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৬.৯	৩৪.১ ↓
পাসপোর্ট	৭৬.১	৫৯.৩ ↓
ভূমিসেবা	৪৯.৮	৩৭.৯ ↓
বিদ্যুৎ	২৮.৪	১৮.৬ ↓
কর ও শুল্ক	১৪.৭	৯.৪ ↓
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৬০.৭ ↓
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	১৮.৩ ↓
ব্যাংকিং	১.৮	১.১ ↓
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১০.০	৫.৭ ↓

** ২০১৫ ও ২০১৭-এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী ↑ চিহ্ন দিয়ে বৃদ্ধি এবং ↓ চিহ্ন দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে ।*

সার্বিকভাবে ২০১৫-এ বিভিন্ন খাত থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয়, যার মাত্রা ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ (সারণি ৫)। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোট ৯টি খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার কমেছে। পক্ষান্তরে এই হার ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন খাতের সংখ্যা ৭টি ।

সুপারিশ

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে :

১. **দুর্নীতিতে জড়িতদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা ও শাস্তি প্রদান :** বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান ও পরিচয়নির্বিশেষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. **দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ :** সেবা খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে।

৩. **নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন :** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সৃষ্টি :** দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে সেবাদানের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. **সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি :** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **জনগণের সচেতনতা ও গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি :** দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. **তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন :** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যের অভিগম্যতা। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'

ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১'-এর কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সব অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. **তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** সেবাগ্রহীতার সঙ্গে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জনগণের সেবা-সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. **অভিযোগ নিরসনপ্রক্রিয়া প্রচলন ও নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন :** সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন-প্রক্রিয়া প্রচলন ও কার্যকর করতে হবে এবং নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। নাগরিক সনদ নিয়মিত হালনাগাদ ও এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ :** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে যেন সেবাগ্রহীতারা সহজে ও কম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারেন ও দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস পায়।

১১. **জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিক বরাদ্দ বৃদ্ধি :** জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি দূরীকরণে সেবা খাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. **রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ :** দুর্নীতি প্রতিরোধে সব পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] p1=probability of having IMPS PSUs from national population, p2=probability of selecting sampled PSUs from IMPS, p3=probability of selecting PSUs in a stratum, p4=probability of selecting a segment of 100 hhs from hhs in a selected PSU, p5=probability of selecting 12 hhs from the segment; p=p1*p2*p3*p4*p5; weight=1/p, পরে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[২] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৩] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায়, যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়, যা SE নামে পরিচিত।

[৪] জাতীয়ভাবে নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ১ শতাংশ এবং ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং গড় সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ৩৫, গণশুমারি রিপোর্ট, ১৫ মার্চ, ২০১১, বিবিএস।

[৫] জাতীয়ভাবে খানার ৯৮ দশমিক ৯ শতাংশ বাঙালি এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, গণশুমারি রিপোর্ট, ১৫ মার্চ, ২০১১, বিবিএস।

[৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬' অনুযায়ী জরিপকৃত খানাগুলোর মাসিক আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা এবং খানাগুলোর মাসিক ব্যয় ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা।

[৭] চলতি বাজারমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির আকার ১৯ লাখ ৫৬ হাজার ৫৫ কোটি টাকা (সূত্র : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭)।

[৮] ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৩ লাখ ১৭ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

তাসলিমা আক্তার ও মো. জুলকারনাইন

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ (৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা) সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে।[১] বাংলাদেশের চিকিৎসকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৬০ দশমিক ৩ শতাংশ) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[২] গত চার দশকে নিবন্ধিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে–১৯৮২ সালে ৩৩টি থেকে বর্তমানে এর সংখ্যা ১৫ হাজার ৬৯৮টি।[৩] সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং নীতিতেও এ খাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২১) বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সরকারি বিধিবিধান তৈরি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মানবিষয়ক তথ্য সেবাগ্রহীতাকে সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী সংগঠন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৪] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (২০১১) বেসরকারি সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্যসেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা, মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ব্যয় সহনীয় মাত্রায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন[৬] ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে[৭] বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়, যার মধ্যে উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়, প্রত্যাশিত সেবার মানের ঘাটতি, সঠিক রোগ নির্ণয় না হওয়া, কমিশননির্ভর সেবা, নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে বলা হলেও সার্বিকভাবে এ খাতের সুশাসন নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। টিআইবির কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত এবং ইতিমধ্যে সরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে টিআইবির স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

---

*২০১৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা এবং
- অনিয়ম ও দুর্নীতির পেছনে বিদ্যমান কারণ চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা বলতে ব্যক্তিমালিকানাধীন নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয়কেন্দ্র প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা ও নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান ও তাদের সক্ষমতা), প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল, অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিপণন কার্যক্রম), সেবা কার্যক্রম (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সেবা, রোগ নির্ণয়, জরুরি ও বিশেষায়িত সেবা, অস্ত্রোপচার, প্রসূতিসেবা, ওষুধ, সেবার মূল্য, চিকিৎসাসেবার পরিবেশ, তথ্য প্রকাশ) এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম (নিবন্ধন ও নবায়ন, মালিকানা ও অংশীদারত্ব, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পরিদর্শন, অভিযোগ, জরিমানা ও শাস্তি)। উল্লেখ্য, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও এ খাতে কর্মরত সব চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা এবং গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও সেবাদাতা, সেবাগ্রহীতা, নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য অংশীজনের কাছ থেকে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট তথ্যদাতা ৭০৬ জন), ফোকাস দল আলোচনা (মোট ২৭টিতে অংশগ্রহণকারী ৩১০ জন; ১৪টি পুরুষের ও ১৩টি নারীর অংশগ্রহণে) ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সারা দেশে নিবন্ধিত ১১৬টি (হাসপাতাল ৬৬টি ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ৫০টি) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি বিভাগীয় শহর, প্রতিটি বিভাগের অধীন একটি করে আটটি জেলা শহর ও বাছাই করা জেলার অধীন একটি করে আটটি উপজেলা শহর (মোট ২৪টি) থেকে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় এবং জনসংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা মহানগরীর মধ্য থেকে ২৬টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকা

থেকে ৯০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের মতামত বিবেচনা করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, সরকারি নথিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যালোচনা

বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০, মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭ ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বিদ্যমান।

তবে বেশ কিছু আইন ও বিধি থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান আইন 'দ্য মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' প্রণয়নের পর এখন পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়নি এবং এই আইনের কোনো বিধিমালাও করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে সব অংশীজনের সমন্বয়ের ঘাটতি, আইন প্রণয়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হয়নি। কার্যত নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আইনের নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা যায়।

নিবন্ধন, অবকাঠামো ও জনবল : সেবার ধরন অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং সে সংজ্ঞা অনুযায়ী সেবার আওতা নির্ধারণ করা হয়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন কোন কর্তৃপক্ষ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কত দিন পর নবায়ন করতে হবে, সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানভেদে সেবার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম মান (আবশ্যিক ইউনিট, এর অবকাঠামো, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা, শয্যা অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবল) সম্পর্কে যেমন বলা হয়নি, রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সেবাপ্রদানকারীর ন্যূনতম সংখ্যা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কেও বলা হয়নি। সেবাগ্রহীতাদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে বলা হলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।[৮]

সেবার মূল্য : অধ্যাদেশে উল্লিখিত সেবার মূল্য তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বর্তমান সময়ের জন্য এটি বাস্তবসম্মত নয়। অধ্যাদেশে সার্জিক্যাল অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবার মূল্য (অপারেশন চার্জ, ওষুধ, এনেসথেসিয়া চার্জসহ সাধারণ ডেলিভারি) এবং রেডিওলজি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে বলা হলেও তা হালনাগাদ করা হয়নি।[৯] এ ছাড়া কোনো কোনো সেবার মূল্য সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়নি (যেমন শয্যা, ভর্তি ফি ইত্যাদি)। চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কে বলা হলেও এই আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়েছে[১০], কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। পরামর্শ ফি এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বিভিন্ন সেবা মূল্য চেম্বার, ক্লিনিক ও পরীক্ষাগারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন[১১] সম্পর্কে বলা হলেও ১৯৮৪ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে ধারাটি পরিবর্তন করে আইনে নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে ওই প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদর্শন করতে বলা হয়।[১২]

তথ্য সংরক্ষণ : নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য (নিবন্ধন ও নবায়ন, পরিদর্শন, জনবল ইত্যাদি) সংরক্ষণব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। চিকিৎসক এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাগ্রহীতার সেবা সম্পর্কিত তথ্য (রোগের ধরন, প্রদত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধ, জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা, প্রসূতিসেবা ইত্যাদি) সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

শাস্তি : বিদ্যমান আইনে শাস্তির পরিমাণ বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে খুব কম। তা ছাড়া সেবা প্রদানে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে সেবাগ্রহীতা কোথায় অভিযোগ করবেন, সে সম্পর্কে বলা হয়নি। এ ছাড়া প্রায়ই চিকিৎসক কর্তৃক অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেলেও এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ করার কোনো বিধান নেই। অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়ই সেবা-সম্পর্কিত বিষয় (সেবাগ্রহীতার মৃত্যু ও অন্যান্য) নিয়ে চিকিৎসক, হাসপাতালে কর্মরত ব্যক্তি ও সেবাগ্রহীতার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা, মারামারি এবং হাসপাতাল ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটলেও সেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠান সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন নেই। সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান বা খাত নিয়ে কোনো বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়নি।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রতিষ্ঠানের মালিক ও অংশীদার

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা ও অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী (পুলিশ, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক,

চিকিৎসকের স্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, মেডিকেল প্রতিনিধি, প্রবাসী, ব্যবসায়ী, করপোরেট গ্রুপ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পল্লি চিকিৎসক, শিক্ষক, ওষুধ বিক্রেতা, গৃহিণী ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের সংখ্যা সর্বনিম্ন দুজন থেকে সর্বোচ্চ ২২৬ জন পর্যন্ত। একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক ও সাংবাদিক। অন্যদিকে সেবাগ্রহীতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স, পল্লি চিকিৎসক, মেডিকেল প্রতিনিধিদের মালিক বা অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নবায়ন

লাইসেন্স ছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা রোগ নির্ণয় কেন্দ্র পরিচালনা করা অনুমোদিত না হলেও গবেষণায় দেখা যায়, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের অনুমোদন না নিয়েই চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু করে। এ ছাড়া সারা দেশে কতগুলো অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার হিসাব কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) অনুযায়ী[১৩] হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিকে পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে হলেও নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৭টি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়নি বলে দেখা যায়।

এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী[১৪] তালিকাভুক্ত কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান (হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসহ) আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ২২টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই ভবনে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধনের সময় জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি ও অবস সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন নিলেও পরে অনুমোদন না নিয়েই বিশেষায়িত সেবা (আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ, কার্ডিয়াক প্রভৃতি) প্রদান করছে বলে দেখা যায় (নির্বাচিত ৬৬টি হাসপাতালের মধ্যে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে ২০টি প্রতিষ্ঠান)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত শয্যা ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং এর মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠান এর জন্য অনুমোদন নেয়নি।

নিবন্ধন-প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আদায় করা অর্থের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, মালিক বা অংশীদারদের উপরমহলে যোগাযোগ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

প্রদত্ত লাইসেন্সে নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স নবায়ন করার কথা উল্লেখ থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান

যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন করায়নি। কিছু ক্ষেত্রে নবায়নের শর্ত শতভাগ পূরণ না করা সত্ত্বেও নবায়ন দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিদর্শনের তারিখ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগে থেকে অবহিত করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনবল ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঠিক রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবায়নের সব শর্ত পালনে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে একদিকে নবায়ন পাচ্ছে এবং অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন না করেই অর্থের বিনিময়ে নবায়ন দেওয়া হচ্ছে, যার পরিমাণ ৫০০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

অধিকাংশ ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র চিকিৎসাসেবার জন্য উপযোগী করে তৈরি ভবনে অবস্থিত হওয়ায় চিকিৎসাসেবার জন্য যথাযথ নয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২টি)। ভর্তিরত প্রতি সেবাগ্রহীতার জন্য বরাদ্দকৃত মেঝের আয়তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই কম। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি কেবিনকে হার্ডবোর্ড দিয়ে দুটি কক্ষ করা, আবার কোনো ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট কক্ষের মধ্যে তিন থেকে চারটি শয্যা রাখা হয়েছে। একটি আইসিইউ কক্ষে শয্যা রাখার কারণে চলাফেরার জন্য স্থানের পরিমাপ খুবই কম দেখা যায়।

উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে জরুরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি হাসপাতাল বা ক্লিনিকের মধ্যে ২১টিতে)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানে অপারেশনের ব্যবস্থা থাকলেও এর মধ্যে নয়টি প্রতিষ্ঠানে পোস্ট-অপারেটিভ কক্ষ নেই, আবার কিছু ক্ষেত্রে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ সেবাগ্রহীতাদের জন্য ব্যবহার করা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে পৃথক নমুনা সংগ্রহ কক্ষ নেই এবং প্যাথলজিস্টদের জন্য পৃথক কক্ষ নেই ২৪টি প্রতিষ্ঠানে।

তিনতলার বেশি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে লিফট-সুবিধার কথা বলা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনতলার বেশি উঁচু ৬৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১টি প্রতিষ্ঠানের লিফটের ব্যবস্থা নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি এবং লিফট স্ট্রেচার বা ট্রলি ব্যবহারের জন্য যথাযথ নয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। জরুরি ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১২টি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে, তবে চারটি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটর থাকলেও প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের সময় তা সক্রিয় দেখা যায়নি। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য ট্রলি বা স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার ছিল না। প্যাথলজিতে যন্ত্রপাতি ও রি-এজেন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সর্বদা এসি চালু থাকার প্রয়োজন থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে এসি নেই আবার কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও তা সর্বদা ব্যবহার করা হচ্ছে না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পার্কিং ব্যবস্থা অপ্রতুল।

চিত্র ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

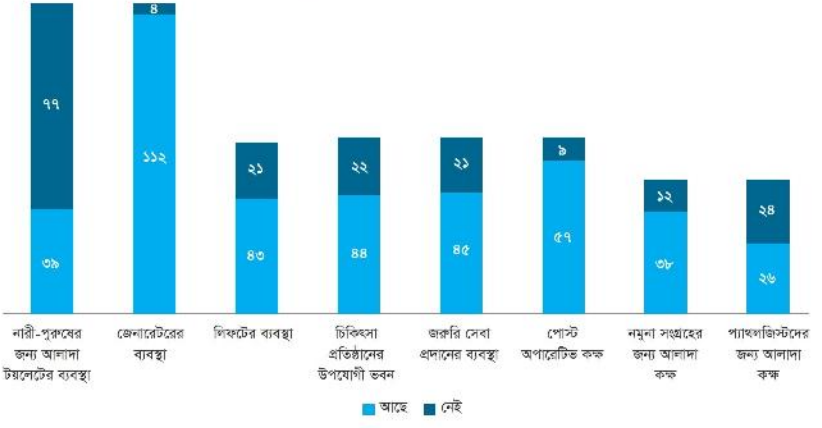

প্রতিষ্ঠানের জনবল

সার্বক্ষণিক চিকিৎসক : আইন অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রতি ১০ শয্যার জন্য তিন শিফটে তিনজন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে গড়ে ১.১, জেলা শহরে ১.৩, বিভাগীয় শহরে (ঢাকা ব্যতীত) ২.৩ এবং ঢাকা মহানগরে ৩.২ জন চিকিৎসক রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের (৬৬টি) মধ্যে ৫২টি প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চিকিৎসক নেই, অনকলভিত্তিক সেবা দিতে হয়।

সারণি ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল

এলাকা	সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই	সার্বক্ষণিক নার্স নেই	সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যা
উপজেলা শহর	১৩	১৪	৭	১৪
জেলা শহর	১৩	১৬	৮	১৬
বিভাগীয় শহর	১১	৯	৬	১৪
ঢাকা মহানগর	১৫	১৪	৮	২২
মোট	৫২	৫৩	২৯	৬৬

সার্বক্ষণিক নার্স : আইন অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রতি ১০ শয্যার জন্য ছয়জন ডিপ্লোমা নার্স রাখার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। বিশ্লেষণে দেখা যায়,

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে গড়ে ১.১, জেলা শহরে ১.৫, বিভাগীয় শহরে (ঢাকা ব্যতীত) ৬.২ এবং ঢাকা মহানগরে ৬.৪ জন নার্স রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের (৬৬টি) মধ্যে ৫৩টি প্রতিষ্ঠানেই সার্বক্ষণিক ডিপ্লোমা নার্স নেই। ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেই কিন্তু কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে নার্সের কাজ করানো হয়। সার্বিকভাবে সারা দেশে শয্যা অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের জন্য ৪৭ হাজার ৫৬ জন নার্স প্রয়োজন হলেও ঘাটতি ২০ হাজার ২৮১ জনের। বিশেষায়িত সেবা প্রদানেও নার্সের স্বল্পতা (বর্তমানে বিশেষায়িত সেবা প্রদানে প্রশিক্ষিত মাত্র ২১০ জন) রয়েছে।[১৫]

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য : উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বেশির ভাগ রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে সনদবিহীন টেকনোলজিস্ট দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে নিজস্ব প্যাথলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট ও সনোলজিস্ট রাখা হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল দিয়ে নিয়ে আসা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অবেদনবিদেরও (এনেসথেসিওলজিস্ট) ঘাটতি রয়েছে।

চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, যেমন জরুরি বিভাগে অক্সিজেন, সাকার মেশিন, নেবুলাইজার, স্টেরিলাইজার, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ইত্যাদি রাখা হয়নি বলে দেখা যায়। এ ছাড়া অপারেশন থিয়েটারে ডায়াথারমি, এনেসথেসিয়া, সক্রিয় ওটি লাইট, স্পট লাইট ইত্যাদি দেখা যায়নি এবং পোস্ট অপারেটিভ কক্ষে কার্ডিয়াক মনিটর, অক্সিজেন বা ভেন্টিলেশন সাপোর্ট ইত্যাদি ছিল না।

ওষুধের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্যাথলজি ফ্রিজ ব্যবহার না করে সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহার করে, আবার সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠান পৃথক থার্মোমিটার ব্যবহার করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠানে নিডল ডেস্ট্রয়ার ব্যবহার করা হয় না বা নিডল ডেস্ট্রয়ার থাকলেও ব্যবহৃত সুই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুই ও সিরিঞ্জ বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথককরণ ও অপসারণের নিয়মটি সঠিকভাবে মানা হয় না। চিকিৎসাসেবাস্থলে বর্জ্যের ধরন অনুসারে সুনির্দিষ্ট রঙের বর্জ্যপাত্র ব্যবহারের কথা বলা থাকলেও[১৬] অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। দেখা যায় ন্যূনতম চার রঙের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল, হলুদ ও নীল) ব্যবহার করছে ১৮টি প্রতিষ্ঠান এবং তিন রঙের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল ও হলুদ) ব্যবহার করছে ৩০টি প্রতিষ্ঠান। কিছু প্রতিষ্ঠানে পৃথক রঙের

বর্জ্যপাত্র রাখা হলেও সব ইউনিটের ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে সব ধরনের বর্জ্য একই ধরনের পাত্রে রাখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা-বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা বর্জ্য অপসারণ যথাযথভাবে করে না। এ ছাড়া চিকিৎসা-বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

হাসপাতাল সংক্রমণমুক্ত করার জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ফিউমিগেশন করা হয় না। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রমণমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহার করা হলেও তথ্য সংগ্রহের সময়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানের অটোক্লেভ যন্ত্র অকার্যকর ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অটোক্লেভ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

প্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধন নেওয়ার সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করলেও পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি মেনে চলা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩২টি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ড ও কেবিনের মেঝে পরিষ্কার না রাখা, আইসিইউ কক্ষের মেঝে স্যাঁতসেঁতে, অপরিচ্ছন্ন চাদর, যত্রতত্র ময়লা ফেলে রাখা, দুর্গন্ধ বের হওয়া, কেবিনের কক্ষগুলো আবদ্ধ ও জানালার ব্যবস্থা না থাকা, আলো-বাতাসের অপর্যাপ্ততা এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির ওপর ধুলাবালি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১টি প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিচ্ছন্ন ছিল না।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবা

চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা

চিকিৎসাসেবা গ্রহণকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বক্ষণিক সেবা পাননি বলে জানান, বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে রাতের বেলায় চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা পাওয়া যায়নি। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সপ্তাহে এক বা দুদিন ওই এলাকার বাইরে থেকে এসে পরামর্শ দিয়ে থাকেন বলে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী জটিলতা বা ফলোআপের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাওয়া যায়নি।

নার্স, আয়া ও ওয়ার্ডবয় প্রদত্ত সেবা

সেবাগ্রহীতার জরুরি প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নার্সকে ডেকে পাওয়া যায়নি; বরং সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের আয়া দিয়ে নার্সের কাজ করানো হয়। সেবাগ্রহীতার প্রয়োজনে আয়াকে ডাকা হলেও দুর্ব্যবহার করেন বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন।

প্রসূতিসেবা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রসবের দিনের অনেক আগে সি-সেকশন করানো, কিছু ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক সি-সেকশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং সিজারের সংখ্যা কম হলে চিকিৎসককে বেতন দেরিতে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মালিকের পক্ষ থেকে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য চিকিৎসক কর্তৃক প্রসূতিকে সি-সেকশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে সিজারিয়ান প্রসবের হার ২০০৪ সালে ছিল ৪ শতাংশ, যা বেড়ে ২০১৪ সালে ২৩ শতাংশ হয়েছে,[১৭] যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এটি হওয়া উচিত ১০-১৫ শতাংশ। বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার ৮০ শতাংশ।[১৮]

বিশেষায়িত সেবা

বিশেষায়িত সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শয্যা অনুসারে কী ধরনের ব্যবস্থা থাকবে, সে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে সেবা প্রদান করছে। রোগী মারা যাওয়ার পরও আইসিইউতে রাখা অথবা আইসিইউ সেবার প্রয়োজন না হলেও আইসিইউতে রাখার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আইসিইউ থেকে প্রতি মাসে সুনির্দিষ্ট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অভিযোগ রয়েছে।

রোগ নির্ণয়

চিকিৎসক কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের রি-এজেন্ট ও মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সাদা প্যাডে আগে থেকে বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষর করে রাখা ও টেকনিশিয়ান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই প্যাডে প্রতিবেদন তৈরি করা, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে টেকনিশিয়ানদের চিকিৎসকের নামে স্বাক্ষর করা, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা না করেই প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যা 'বালতি টেস্ট' হিসেবে পরিচিত ।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিক হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা দীর্ঘদিন চিকিৎসাসেবা নেওয়ার পরও ভালো না হওয়ায় পুনরায় শহরাঞ্চল বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখে আগের প্রতিবেদন সঠিক ছিল না।

সেবার মূল্য

এলাকাভেদে (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয়) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবার মূল্যের ব্যাপক তারতম্য বিদ্যমান। রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের ব্যাপক তারতম্য লক্ষ করা

যায়। উল্লেখ্য, সরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে এসব সেবার মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সারণি ২ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সেবার মূল্যের তারতম্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা

পরীক্ষার নাম	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)
লিপিড প্রোফাইল	৭০০ - ১,৬৫০	৩০০
প্লাটিলেট কাউন্ট	৭০ - ৫০০	৫০
সিরাম ক্রিয়েটিনিন	২১০ - ৫৮০	৫০
সিরাম ক্যালসিয়াম	২১০ - ৭০০	৮০
আলট্রাসনোগ্রাম (হোল এবডোমেন)	৫৫০ - ৮০০ (সাধারণ) ৮০০ - ২,২০০ (ডিজিটাল কালার)	২১০ (সাধারণ)

অন্যদিকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভেদে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সর্বনিম্ন ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা পর্যন্ত দেখা যায়। পুরাতন রোগীর পরামর্শ ফির ক্ষেত্রে ভিন্নতা এবং পরীক্ষার প্রতিবেদন দেখানোর জন্য কিছু ক্ষেত্রে ফি নেওয়া হয়। চুক্তিভিত্তিক সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে শয্যাভেদে সর্বনিম্ন ৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ২ লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়।

ওষুধ সরবরাহ

যেকোনো ধরনের অপারেশনের জন্য সেবাগ্রহীতাকে কখনো কখনো বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হয়, আবার কখনো কখনো প্যাকেজ চুক্তি করা হয়, যার মধ্যে ওষুধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার জন্য কী পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করা হলো তার হিসাব সেবাগ্রহীতা বা তার অ্যাটেনডেন্টকে দেওয়া হয় না এবং চুক্তির মধ্যে সব ওষুধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা দেওয়া হয় না; বরং পরবর্তী সময়ে আরও ওষুধ কিনে দিতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, সেবাগ্রহীতাদের দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওষুধ কেনানো হয় এবং তা থেকে কিছু ওষুধ পরে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবার বিপণনব্যবস্থা

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কমিশনভিত্তিক বিপণনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনাকর্মী, পল্লিচিকিৎসক, ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতা, ধাত্রী, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের রিসিপশনিস্ট, রিকশাওয়ালা ও পেশাদার দালাল। এই কমিশনের পরিমাণ সর্বনিম্ন ২৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সি-সেকশনের জন্য পাঠালেও কমিশন দেওয়া হয়, যার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। সেবাগ্রহীতারা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাদার দালাল কর্তৃক হয়রানি হন বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন ভুল তথ্য দিয়ে বা জোর করে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া। এ ধরনের ঘটনা, বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে আসা অসচেতন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে।

তথ্যের উন্মুক্ততা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৫টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দৃশ্যমান স্থানে টাঙানো নেই এবং ২৮টিতে আংশিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শিত রয়েছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় ভিজিটের ক্ষেত্রে পরামর্শ ফি এবং সময়সীমা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকলেও প্রতিষ্ঠানের সব চিকিৎসকের ক্ষেত্রে দেওয়া নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পরামর্শ ফির রসিদ সেবাগ্রহীতাকে দেয় না বলে জানা যায়। চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত চিকিৎসক সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা হয় না, কোনো ক্ষেত্রে কর্তব্যরত কনসালট্যান্টদের (অনকলভিত্তিক ও স্থায়ী) তথ্যও প্রদর্শিত নেই।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা থাকলেও সব সেবার মূল্য টাঙানো নেই। আবার কিছু ক্ষেত্রে শুধু শয্যার ভাড়া সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৫০টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ২১টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী বর্জ্য-পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য টাঙানো থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯০টি প্রতিষ্ঠানে রংভেদে কোন পাত্রে কী ধরনের বর্জ্য ফেলতে হবে– এ ধরনের নির্দেশিকা প্রদর্শন করা নেই।

এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত চিকিৎসক সম্পর্কে জানতে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। বিএমডিসির রেজিস্টারে অভিযোগের ধরন এবং এর হালনাগাদের ব্যবস্থা নেই; বিএমডিসির ওয়েবসাইটে এ-সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেই।

তদারকি

চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি : বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের তদারকি কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকলেও ওই সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোনো ধরনের পরিদর্শন করে না। তা ছাড়া সব প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করে না বিধায় এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতার বাইরে থেকে যায় এবং তাদের সেবা কার্যক্রম যাচাইয়ের সুযোগ হয় না। পরিদর্শনে অনিয়ম পাওয়া গেলেও পরে তা ফলোআপ করা হয় না।

মোবাইল কোর্ট বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাঝে মাঝে পরিদর্শন এবং নিয়মের ব্যত্যয়ে জরিমানা বা শাস্তি দিলেও তা খুবই সীমিত। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোবাইল কোর্ট জরিমানা করেছে বলে জানা যায়।

চিকিৎসকদের তদারকি : অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের অতিরিক্ত ডিগ্রি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুয়া পদবির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভুয়া চিকিৎসকদের শাস্তি প্রদান করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সরকারি দায়িত্ব পালনকালে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবা প্রদানের অভিযোগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা সুনির্দিষ্ট বেসরকরি প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান না করলেও তাদের নাম ব্যবহার করা হয় বলে দেখা যায়।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা প্রকট। এখানে অতি মুনাফাকেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম, কমিশনভিত্তিক সেবাব্যবস্থা এবং গুণগত মানের চেয়ে সংখ্যাগত বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও এখানে সরকারের যথাযথ মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন পরিকল্পনায় এ খাতকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট আইন হালনাগাদ না করা লক্ষণীয়। এ ছাড়া আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে এক দশকেরও বেশি সময় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন হয়নি।

সারণি ৩ : একনজরে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• আইনি সীমাবদ্ধতা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইন ও বিধির অনুপস্থিতি ও হালনাগাদ আইন না থাকা) • আইন বা নীতির প্রয়োগে ঘাটতি • সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতার (অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি) ঘাটতি • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি • স্বচ্ছতার ঘাটতি • জবাবদিহির ঘাটতি • স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব	• নিবন্ধন ও নবায়নে অনিয়ম • কমিশনভিত্তিক সেবাব্যবস্থা • সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত না হওয়া • বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত সঠিকভাবে না হওয়া • স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা • নিয়মিত তদারকি না হওয়া • সেবার অতিরিক্ত মূল্য	• চিকিৎসাসেবার নামে অতি মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার • প্রতারণানির্ভর চিকিৎসাসেবার প্রসার • সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি • চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি • বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি • রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি

নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন না করা, পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতিও বিদ্যমান। এর ফলে একদিকে এটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে এবং অন্যদিকে কিছু ব্যক্তির এ খাত থেকে বিধিবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি ও অনিয়মের প্রবণতা লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে এই ব্যবস্থার কাছে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা জিম্মি হওয়ার কারণে একদিকে ব্যাপকভাবে আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে এবং অন্যদিকে মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে না।

সুপারিশ

আইন ও নীতি-সম্পর্কিত

১. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে একটি স্বাধীন কমিশন তৈরি করতে হবে।

২. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

- নার্সিং হোম, ক্লিনিক, জেনারেল হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও শয্যা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকরণ করতে হবে। এই শ্রেণি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেমন অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি;
- প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি অনুযায়ী নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণ;
- প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব ছাড়পত্রের বাধ্যবাধকতা;
- প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি/ উৎপাদন খরচ/ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাভেদে বিভিন্ন সেবার মূল্য নির্ধারণ;
- প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বাধ্যবাধকতা;
- শাস্তির পরিমাণ সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মতভাবে বৃদ্ধি।

৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে (তথ্য প্রাপ্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য

৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে (কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে)।

৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৬. অনলাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স আবেদন ও নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

৭. চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবা-সম্পর্কিত সব ধরনের হালনাগাদ তথ্য (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর, নবায়নকাল, সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানকারী জনবল ও তাদের নিবন্ধন নম্বর, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এসব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

৮. চিকিৎসা-বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে সক্রিয় এবং সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়নকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

৯. বিএমডিসির ওয়েবসাইটে সব চিকিৎসকের নিবন্ধন নম্বর এবং শিক্ষার ধরন অনুযায়ী অনুসন্ধানের বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসকের নাম দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং চিকিৎসক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।

১০. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীদের অভিযোগ দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি) পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

১১. চিকিৎসকদের অনৈতিক প্রচারণা ও কার্যক্রম চিহ্নিত ও রোধ করার জন্য সারা দেশে বিএমডিসির তদারকির আওতা বাড়াতে হবে।

১২. অনিবন্ধিত সব চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেবা-সম্পর্কিত

১৪. সব প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব সেবা প্রদানে পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক এবং ব্যবহারোপযোগী টয়লেটের ব্যবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, নারী সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. কর্মরত সব সেবা প্রদানকারীর জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা বা আইডি কার্ড ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. সেবা প্রদানকারীদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে (যেমন নার্সদের ইউনিফর্মে, আইডি কার্ডে, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে ও ভিজিটিং কার্ডে)।

তথ্যসূত্র

[১] টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫*, (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৬)।

[২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *হেলথ বুলেটিন ২০১৫*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৬।

[৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৭।

[৪] পরিকল্পনা কমিশন, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

[৫] স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

[৬] মু. মাহবুব আলি, 'আউটবাউন্ড মেডিকেল ট্যুরিজম : দ্য কেস অব বাংলাদেশ', *ওয়ার্ল্ড রিভিউ অব বিজনেস রিসার্চ*, ভলিউম ২, জুলাই ২০১২, পৃ. ৫০-৭০।

[৭] দেখুন দৈনিক *যুগান্তর*, ১২ জানুয়ারি ২০১৬; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৭ জানুয়ারি ২০১৬; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; দৈনিক *যুগান্তর*, ৩ মার্চ ২০১৬; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৯ মার্চ ২০১৬; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৯ মে ২০১৫; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৩ জুন ২০১৫; দৈনিক *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫; *দ্য নিউ এজ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; *দ্য নিউ নেশন*, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; *দ্য নিউ এজ*, ৬ ডিসেম্বর ২০১৫।

[৮] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, ১৯৮২, ধারা ৯।

[৯] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৩।

[১০] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪*, ধারা ৫।

[১১] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, ১৯৮২, ধারা ৭।

[১২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪*, ধারা ৪।

[১৩] পরিবেশ অধিদপ্তর, *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা* ১৯৯৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

[১৪] *প্রাগুক্ত*।

[১৫] *স্বাস্থ অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৬*

[১৬] পরিবেশ অধিদপ্তর, *চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

[১৭] ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (নিপোর্ট), মিত্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, আইএফসি ইন্টারন্যাশনাল, *বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১৪*, (ঢাকা, বাংলাদেশ, মেরিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : নিপোর্ট, মিত্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, আইএফসি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬); বিস্তারিত, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR311/FR311.pdf(২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

[১৮] 'স্টপ আননেসেসারি সি-সেকশন ২০১৬'; বিস্তারিত, http://www.stopuncs.org/Bn/Faq(২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. খোরশেদ আলম ও মনজুর ই খোদা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে সমুদ্রপথে।[১] কারণ সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর।[২] অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূলত সমুদ্রবন্দরের ওপর নির্ভরশীল।[৩] দেশের আমদানি-রপ্তানির পণ্যের ৯০ শতাংশের বেশি সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়।[৪] আর এ বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রবন্দরগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান এবং এ-সম্পর্কিত কার্যকর নীতিনির্ধারণ জরুরি।[৫]

১৯৫০ সালে যাত্রা শুরু হওয়া মোংলা সমুদ্রবন্দর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মোংলা বন্দরের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।[৬] চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তথা পদ্মা সেতু, রূপসা রেল সেতু ও খানজাহান আলী বিমানবন্দরসহ অত্র অঞ্চলের অবকাঠামোগত রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মোংলা বন্দরের আন্তর্জাতিক জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ১৯৫০ সালে খুলনার চালনা নামক স্থানে 'চালনা শুল্ক কাচারি'র যাত্রা শুরু হয়, যা ১৯৬৫ সালে 'মোংলা কাস্টম হাউস' নামে পরিবর্তিত হয়।

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতের ওপর গবেষণা ও নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতিমধ্যে টিআইবি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোতে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী ও ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করেছে।[৭] মোংলা বন্দরকেন্দ্রিক অন্যান্য গবেষণায় বন্দরের সক্ষমতা বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ এবং মোংলা কাস্টম হাউসের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয় না। এই গবেষণাগুলোতে গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে চ্যানেলে পলি

*২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

অবক্ষেপণের উচ্চ হার, অপর্যাপ্ত ড্রেজিং, পুরোনো উপকরণ, পশ্চাদ্‌ভূমির সাথে দুর্বল যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়।[৮] এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজের আগমন-বহির্গমন এবং পণ্যের শুল্কায়ন ও ছাড় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ হয়েছে। আঞ্চলিক গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) পক্ষ থেকে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউস নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করার চাহিদার প্রেক্ষাপটে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

মোংলাবন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনার করার লক্ষ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- মোংলা বন্দর ও মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা;
- মোংলা বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের ধরন নিরূপণ করা;
- মোংলা কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের ধরন নিরূপণ করা;
- বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণাটিতে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস হিসেবে পর্যবেক্ষণ ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটি বিভিন্ন পর্যায়ের ১০৬ জন মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দাপ্তরিক দলিল, প্রবন্ধ, সাময়িকী, ওয়েবসাইট, অন্যান্য প্রকাশনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালিত হয় জুলাই ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ : মোংলা কাস্টম হাউস

বন্দর ও কাস্টম হাউসের মধ্যকার দূরত্ব ৫৩ কিমি, ফলে সেবাগ্রহীতাদের সময়ক্ষেপণের শিকার হতে হয়। দূরত্বের কারণে একই দিনে কাস্টমস থেকে পরীক্ষণের নোটিশ নিয়ে মালামালের কায়িক পরীক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যের শুল্কায়ন ও খালাস-বোঝাই কার্যক্রমের একাংশ মোংলা কাস্টমসে এবং অপরাংশ মোংলা বন্দরে সম্পন্ন করতে হয়। ফলে সেবাগ্রহীতারা সময়ক্ষেপণ ও হয়রানির শিকার হন, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হয়।

কাস্টম হাউসের জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে প্রায় ৪০ শতাংশ জনবল ঘাটতি রয়েছে। নথিভুক্তকরণসহ বিভিন্ন কাজে সেবাগ্রহীতারা কাস্টমসের কর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণমাত্রায় সেবা পান না। অন্যদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওভারটাইম করতে হয়। বাল্ক জাহাজে সার্ভে পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জনবল মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষের না থাকায় সার্ভে পরিচালনার জন্য তৃতীয়পক্ষ হিসেবে বেসরকারি সার্ভে প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে এ ক্ষেত্রে একদিকে শুল্ক ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে সার্ভেয়ার কর্তৃক হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটে।

মোংলা কাস্টম হাউসে ব্যবহারকারীরা অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ব্যবহার করলেও তা সেবা সহজীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে না। অনলাইনে আবেদন করা হলেও মুদ্রিত অনুলিপিগুলোতেই বিভিন্ন পর্যায় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়, আর এ জন্য সেবাগ্রহীতাদের কাস্টম হাউসে টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরতে হয়। এসব কারণে সেবাগ্রহীতারা প্রয়োজনীয় সেবা পেতে দীর্ঘসূত্রতা, সময়ক্ষেপণ ও হয়রানির শিকার হন।

মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ কনটেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে। প্যাকেট কেটে পণ্য মিলিয়ে দেখায় অনেক ক্ষেত্রে প্যাকেটগুলো পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আবার শতভাগ কায়িক পরীক্ষণের কারণে হয়রানি ও সময়ক্ষেপণের ঘটনা ঘটছে। পণ্যের শুল্কায়ন ও পরীক্ষণের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল। কনটেইনারে আমদানি করা একটি বাণিজ্যিক চালানের শুল্কায়নে অন্তত ১৬টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। আর রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্তত ১২টি ধাপে নথিপত্র যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন করাতে হয়। ব্যবহারকারীদের মতে, এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল এবং এর ফলে বিভিন্ন মাত্রায় দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

সারণি ১ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

পণ্যের ধরন	বিল অব এন্ট্রি সংখ্যা	ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার (টাকা)	আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
গাড়ি	১৬,১৮৭	৪,০০০	৬.৪৭
কনটেইনার/বাণিজ্যিক	২,২১৩	৩৫,৭০০	৭.৯০
বাল্ক	৫৮৩	২২,৬০০	১.৩২
মোট			১৫.৬৯

আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে মোংলা কাস্টম হাউসে প্রায় প্রতিটি ধাপে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। পণ্যের ধরন অনুযায়ী নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ভিন্ন হয়।

আমদানিকৃত একটি বাণিজ্যিক চালানের নথিপত্র ও পণ্যের ধরনসহ সবকিছু ঠিক থাকলেও শুল্কায়নের বিভিন্ন ধাপে ন্যূনতম ৩৫ হাজার ৭০০ টাকা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করেন। এ ছাড়া একটি গাড়ির শুল্কায়নে বিভিন্ন ধাপে ন্যূনতম ৪ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়।

সমুদ্রগামী জাহাজের আগমন-বহির্গমন অনুমোদন ও প্রযোজ্য মাশুল প্রদানে মোংলা কাস্টম হাউসে অন্তত ৮টি ধাপে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। অনলাইনে আইজিএম পেশ, বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনাপত্তি সনদ সংগ্রহ, মোংলা কাস্টম হাউস থেকে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ এবং জাহাজ চলে যাওয়ার পর কাস্টম হাউসে ইজিএম পেশ করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। তথ্যদাতাদের মতে, এই ধাপগুলো দীর্ঘ, জটিল এবং এতে সময়ক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রতা, হয়রানি ও সর্বোপরি দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

সমুদ্রগামী জাহাজের আগমন-বহির্গমন সম্পর্কিত মোংলা কাস্টম হাউসের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে শিপিং এজেন্টকে কাস্টম অফিসের বিভিন্ন ধাপে ন্যূনতম ৮ হাজার ৩৫০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এই হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে মোট ৬২০টি জাহাজের ব্যবস্থাপনায় মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক আদায়কৃত ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ প্রায় ৫১ দশমিক ৭৭ লাখ টাকা।

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ : মোংলা বন্দর

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মোট জনবলের বিপরীতে ঘাটতি প্রায় ৫৯ শতাংশ। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে জনবল ঘাটতি সবচেয়ে কম (৩৯ শতাংশ) এবং চতুর্থ শ্রেণিতে জনবল ঘাটতি সবচেয়ে বেশি (৬৭ শতাংশ)।[৯] জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় মোংলা বন্দরের ড্রেজিং ইউনিট দুটি বর্তমানে ভাড়ায় চালানো হচ্ছে। বন্দরে ক্রেন পরিচালনায় দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যা সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সময়ক্ষেপণ ও দায়িত্বে অবহেলার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

বন্দর চ্যানেলে সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভিন্ন নেভিগেশনাল উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। নাইট নেভিগেশনের জন্য সবচেয়ে জরুরি লাইটেড বয়া বন্দর চ্যানেলে সীমিত। ফলে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো নাইট নেভিগেশন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। নেভিগেশনাল এইডসের ঘাটতির কারণে জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বৃদ্ধি ও জাহাজ ভাড়া বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামগ্রিকভাবে আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বন্দরে গাড়ি রাখার জন্য বিশেষায়িত শেড নেই। শেডগুলোতে জায়গার অপর্যাপ্ততার কারণে বাইরে খোলা আকাশের নিচে ইয়ার্ডে, আবার কখনো কাদাপানির মধ্যে অযত্ন ও অবহেলায়

গাড়ি রাখা হয়। ফলে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে গাড়ির মূল রং নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে গাড়ির দামও কমে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন আমদানিকারকরা। আবার পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থায় ঘাটতির কারণে মোংলা বন্দরে গাড়ি থেকে পার্টস চুরির ঘটনা ঘটে।

বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক জলযানগুলো প্রায় ৩০ থেকে ৭০ বছরের পুরোনো। এ ছাড়া ট্রেলিং সাকশন হপার ড্রেজার, রেসকিউ বোট এবং অয়ের রিকভারি ভ্যাসেল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জলযান মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নেই। পুরোনো জলযান ও প্রয়োজনীয় জলযানের অপর্যাপ্ততা বন্দরের দীর্ঘ চ্যানেলে নিরাপত্তার সংকট সৃষ্টি করে।

বন্দরে আমদানি পণ্যছাড় প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল। বন্দরে কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে সেবাগ্রহীতারা হয়রানি, সময়ক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রতার শিকার হচ্ছেন। পণ্যছাড় প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ধাপেই নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। অফিস সময়ের মধ্যে প্রতি কনসাইনমেন্ট বাণিজ্যিক পণ্য খালাস করতে বন্দরে বিভিন্ন ধাপে মোট ৫ হাজার ৭০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যয় করতে হয়। আর বিকেল পাঁচটার পর কিংবা ছুটির দিনে এক কনটেইনার বাণিজ্যিক পণ্যছাড় করাতে নিয়মবহির্ভূতভাবে ন্যূনতম ৭ হাজার ২০০ টাকা খরচ করতে হয়। একইভাবে আমদানিকৃত গাড়ি ছাড় করাতে বন্দরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যূনতম ১ হাজার ৭১৫ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়।

সারণি ২ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোংলা বন্দর কর্তৃক আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

পণ্যের ধরন	বিল অব এন্ট্রি সংখ্যা	ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার (টাকা)	আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
গাড়ি	১৬,১৮৭	১,৭১৫	২.৭৮
কনটেইনার/বাণিজ্যিক	২,২১৩	৫,৭০০	১.২৬
বাল্ক	৫৮৩	৯,৯০০	০.৫৮
মোট			৪.৬১

মোংলা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ আগমন-বহির্গমনে বিভিন্ন অনুমোদন প্রদান ও মাশুল আদায়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল, যার ফলে জাহাজ ব্যবস্থাপনায় সময়ক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেবাগ্রহীতারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য বিভিন্ন সেবা গ্রহণ, বিভিন্ন অনুমোদন গ্রহণ ও মাশুল প্রদানের প্রতিটি ধাপে নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়। বন্দরে প্রতিটি সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবস্থাপনায় সেবাগ্রহীতাদের ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যয় করতে হয়। এই হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে মোট ৬২০টি জাহাজের ব্যবস্থাপনায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ৩০ কোটি টাকা।

মোংলা বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা দিলেও এই চ্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচলে সময় বেশি লাগে। ফেয়ার ওয়ে থেকে মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত পশুর চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ১৩১ কিমি এবং সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে সর্পিলাকারে এঁকেবেঁকে এসেছে। ফলে জোয়ার-ভাটার এই চ্যানেলে পলি সৃষ্টি ও এর প্রবাহ অন্য যেকোনো নদীর চেয়ে বেশি। আবার উজান থেকে পানির প্রবাহ কম থাকায় চ্যানেলের তলদেশে পলি অবক্ষেপণের হারও অনেক বেশি।

পশুর চ্যানেলে ও সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় ডুবে যাওয়া জাহাজগুলোর কারণে ডুবে যাওয়ার স্থলে পলি অবক্ষেপিত হয়ে নাব্যতার সংকট তৈরি হয়েছে। দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সড়ক, রেল ও নৌপথে মোংলা বন্দরের সীমিত যোগাযোগব্যবস্থার কারণে এই বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে ব্যবহারকারীদের নানামুখী প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়।

অন্যান্য অনিয়ম

স্টিভিডোর প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়মের শিকার হওয়া : জাহাজে কাজ করার ক্ষেত্রে স্টিভিডোর প্রতিষ্ঠানগুলোকে জেটি ব্যবহার করার জন্যবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয় ও প্রযোজ্য মাশুল প্রদান করতে হয়। বন্দরে প্রতিবার এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নিয়মবহির্ভূতভাবে ৪ হাজার ৮০০ থেকে ৬ হাজার টাকা খরচ করতে হয়।

স্টিভিডোর প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম : স্টিভিডোর প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশ বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত গ্যাং করার নিয়ম ভেঙে কম শ্রমিক দিয়ে জাহাজে কাজ করায় এবং কাজ শেষে নানা অজুহাতে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি আটকে রাখে। এই অনিয়মের কারণে শ্রমিকরা বন্দর এলাকার কিছু সুদী মহাজনের কাছে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কম মূল্যে মজুরির স্লিপ বিক্রি করতে বাধ্য হন।

লাইটার নৌযান-সম্পর্কিত অনিয়ম : লাইটারেজ নৌযানগুলো নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে নিয়মিত ডকিং করানো হয় না। এতে নৌযানগুলোতে দৈহিক ত্রুটির কারণে নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। আবার এক-তৃতীয়াংশ লাইটার নৌযানের সনদ হালনাগাদ করা হয় না বা সনদ নেই। একশ্রেণির অসাধু কাস্টমস কর্মকর্তা অনুমোদনহীন নৌযানপ্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের পর বোট নোট দিয়ে থাকেন।

ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিসংক্রান্ত অনিয়ম : পণ্য খালাসের জন্য জেটি গেট দিয়ে ট্রাক প্রবেশের সময় নিয়োজিত বন্দরকর্মীরা ট্রাকপ্রতি আদায় করেন ৭০ টাকা, কিন্তু রসিদ দেওয়া হয় ৫০ টাকার। আবার ট্রান্সপোর্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতি ৫ ট্রাক পণ্য বোঝাইয়ের জন্য ক্রেন অপারেটরকে ন্যূনতম ১ হাজার থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত বকশিশ দিতে হয়। এই অর্থ না দিলে পণ্য বোঝাইয়ে অহেতুক সময়ক্ষেপণ ও অযত্নের সাথে ক্রেন থেকে পণ্য ফেলা হয়। অন্যদিকে পণ্য

বোঝাইয়ের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক গ্যাংকে ট্রাকপ্রতি ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত বকশিশ দিতে হয়।

সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে মোংলা বন্দর ও কাস্টমসের পর্যালোচনা

স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততা : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে যা তথ্যসমৃদ্ধ। পাশাপাশি বন্দর কর্তৃপক্ষ সিটিজেন চার্টার, ভাঁজপত্র ও নোটবুকের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে।[১০] ট্যারিফ চার্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি বই আকারেও প্রকাশ করা হয়। চ্যানেলের ড্রাফট চার্ট হালনাগাদ রাখা হয় এবং সেবাগ্রহীতাদের জন্য প্রকাশ করা হয়। কর্তৃপক্ষ সমুদ্রগামী জাহাজ, আমদানি-রপ্তানিকৃত পণ্য, পণ্যের ধরন, কনটেইনার ইত্যাদি পরিসংখ্যানও হালনাগাদ রাখে। বন্দরে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। অন্যদিকে মোংলা কাস্টম হাউস প্রদত্ত সেবার স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়সহ বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময় ওয়েব ঠিকানাটি সক্রিয় ছিল না। বর্তমানে সক্রিয় করা হলেও অধিকাংশ তথ্যই হালনাগাদ করা নেই। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকলেও তার নাম, পদবি, যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটির প্রবেশপথে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র থাকলেও সেখানে কাউকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি।

সক্ষমতা ও কার্যকারিতা : মোংলা বন্দরে কর্মকর্তা পর্যায়ের তুলনায় কর্মচারী পর্যায়ে জনবল ঘাটতি প্রায় দ্বিগুণ। বন্দরে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের জন্য অটোমেশন নেই। কার্যক্রমে অন্তঃবিভাগীয় এবং আন্তবিভাগীয় সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার বন্দর কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক উদ্যোগ হলেও এই সেবা কার্যকর নয়–সেবাগ্রহীতাকে টেবিল থেকে টেবিলে ছুটতে হয় এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। আমদানি পণ্য ছাড় এবং রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল হওয়ায় প্রতিটি ধাপেই সেবাগ্রহীতাকে ভোগান্তি ও জটিলতায় পড়তে হয়, যা এড়াতে ও দ্রুত সেবা পেতে বিভিন্ন মাত্রায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়।

মোংলা কাস্টম হাউসে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে ৪০ শতাংশ পদ শূন্য থাকায় কার্যক্রম পরিচালনায় নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। বন্দর হতে মোংলা কাস্টম হাউসের মধ্যকার দূরত্ব ৫৩ কিমি হওয়ায় সেবাপ্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয় বৃদ্ধিসহ আন্তবিভাগীয় সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হয়। ভেহিকেল মাউন্টেড মুভেবল কনটেইনার স্ক্যানিং মেশিন আমদানি করা হলেও এর মাধ্যমে পণ্য স্ক্যানিং ব্যবস্থা সক্রিয় নয়। সেবাগ্রহীতারা অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড নামক অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করলেও ব্যবহারকারীদের টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরে কাজ করিয়ে নিতে হয়। পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল এবং ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন মাত্রায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

জবাবদিহি : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েব ঠিকানায় অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। লিখিত অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে বন্দরে প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশপথে স্বচ্ছ কাচের বাক্স স্থাপন এবং অভিযোগ ব্যবস্থপনায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করা আছে। অভিযোগ নথিভুক্ত রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়। জবাবদিহি নিশ্চিতে গণশুনানি আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও কোনো গণশুনানি আয়োজন করা হয়নি। বন্দরের সব বিভাগের কার্যক্রমের বার্ষিক নিরীক্ষণ, পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় তদারকি ব্যবস্থা বিদ্যমান।

অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণে মোংলা কাস্টম হাউসের প্রবেশপথে কাঠের বাক্স স্থাপন করা থাকলেও অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। এমনকি অভিযোগ নথিভুক্ত রাখার জন্য কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষের কোনো রেজিস্টারও নেই। কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ কোনো গণশুনানি আয়োজন করে না। কার্যক্রমের বার্ষিক নিরীক্ষণ সরকারের নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে প্রতিবছর সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ : মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসে সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপস্থিতি থাকলেও পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ের প্রায় প্রতিটি ধাপে নিয়মবহির্ভূত লেনদেন বিদ্যমান। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ বিরাজমান দুর্নীতির সংস্কৃতিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি।

উপসংহার

গবেষণার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সার্বিকভাবে উভয় প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসের কর্মীদের একাংশকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠানেই অটোমেশন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিসের প্রচলন হলেও তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। উভয় প্রতিষ্ঠানেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাঠামোব্যবস্থা উপস্থিত থাকলেও তার প্রায়োগিক পর্যায়ে কার্যকারিতার ঘাটতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

সুপারিশ

প্রতিবেদনে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণের জন্য টিআইবির পক্ষ থেকে নিচে উল্লিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। টিআইবির প্রত্যাশা, এসব সুপারিশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউসের সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে।

১. পণ্যের শুল্কায়ন, কায়িক পরীক্ষণ, পণ্যছাড় ও জাহাজের আগমন-বহির্গমন প্রক্রিয়া অনুমোদনে মোংলা কাস্টম হাউস ও বন্দরে কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
২. সব পর্যায়ে অটোমেশন চালু ও পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. পণ্যের শতভাগ কায়িক পরীক্ষণের পরিবর্তে দৈবচয়নের ভিত্তিতে আংশিক (১০ থেকে ২০ শতাংশ) কায়িক পরীক্ষণ করতে হবে।
৪. বাল্ক পণ্যের জাহাজে সার্ভে করানোর জন্য দক্ষ জনবলসহ নিজস্ব সার্ভে ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. শুল্কায়ন কার্যক্রমকে দ্রুত ও সহজতর করতে মোংলায় কাস্টম হাউসের পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় স্থাপন করতে হবে।
৬. প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনাসাপেক্ষে মোংলা কাস্টম হাউস ও বন্দরে বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ করতে হবে।
৭. প্রতিবছর বন্দর ও কাস্টম হাউসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও আর্থিক বিবরণ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। বৈধ আয়ের সাথে অর্জিত সম্পদের অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।
৮. বিভিন্ন ধাপে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি বৃদ্ধি এবং সবার জন্য দৃশ্যমান স্থানে মনিটর স্থাপন করতে হবে। সব ধরনের মাশুল ও শুল্ক অনলাইনে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৯. জাহাজের ঝুঁকিমুক্ত নেভিগেশন নিশ্চিতে পর্যাপ্ত নেভিগেশনাল সরঞ্জাম স্থাপন করাসহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
১০. বন্দর চ্যানেলে পূর্ণমাত্রায় সেবা প্রদান নিশ্চিতে পুরোনো ও অকেজো জলযানের পরিবর্তে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নতুন জলযান সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] এসএসমার, 'পারফরম্যান্স মেজারমেন্টস অব কনটেইনার টার্মিনাল অপারেশনস', *জার্নাল অব গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স (জিএসএসএস)*, ভলিউম ১০, নং ১, (ইজমির : দোকুজ এলুল ইউনিভার্সিটি, ২০০৮), পৃ. ২৩৮-৩৫১।

[২] জি এস দ্বারাকিশ ও এ কে সেলিম, 'রিভিউ অব দ্য রোল অব পোর্টস ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অব আ নেশন', ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ওয়াটার রিসোর্সেস, কোস্টাল অ্যান্ড ওশান ইঞ্জিনিয়ারিং (আইসিডব্লিউআরসিওডব্লিউ), *অ্যাকুয়াটিক প্রসেডিয়া* ৪, (এলসেভিয়ার, ২০১৫), পৃ.২৯৫ - ৩০১।

[3] এম এ ইসলাম ও এম জেড হায়দার, 'পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট অব মোংলা সি-পোর্ট ইন বাংলাদেশ', *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি*, ভলিউম ২, নং ২, (নিউইয়র্ক : সায়েন্স পাবলিশিং গ্রুপ, ২০১৬), পৃ. ১৫-২১।

[4] আর সি সাহা, 'পোর্ট ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ', *ইউরোপিয়ান জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট*, ভলিউম ৭, নং ৭, (ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন, ২০১৫), পৃ. ৩৯২-৪০০।

[5] এম জে এ সরকার ও এম এম রহমান, 'অ্যানালাইসিস অব পোর্ট ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ : চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড পোটেনশিয়ালস', *মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৪ (১), (ঢাকা, ২০১৫)।

[6] এম এ ইসলাম ও এম জেড হায়দার, ২০১৬।

[7] তানভীর মাহমুদ ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা : ফলোআপ ডায়াগনস্টিক স্টাডি', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৭); তানভীর মাহমুদ ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৮); মনজুর ই খোদা ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৪); মনজুর-ই-খোদা ও মাহমুদ তালুকদার, 'বুড়িমারী স্থলবন্দরের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম : উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৯); সাঈদুর রহমান মোল্ল্যা, 'ডায়াগনস্টিক স্টাডি : চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৪)।

[8] এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), 'বাংলাদেশ : পোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস এফিশিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট', *টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স কনসালট্যান্টস রিপোর্ট*, জুলাই ২০১১; এম জে এ সরকার ও এম এম রহমান, ২০১৫; আর সি সাহা, 'ইমপ্রুভিং সি-পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ টু ডেভেলপ ফ্রেইট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ', *ইউরোপিয়ান জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট*, ভলিউম ৭, নং ১০, ২০১৫, পৃ. ২৪০–২৬০; এম এ ইসলাম ও এম জেড হায়দার, ২০১৬।

[9] মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, '১০ম জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৭তম বৈঠকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপস্থাপনা', ২০১৭।

[10] মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, 'নাগরিক সনদ', বাগেরহাট, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮।

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন
আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার ও মনজুর ই খোদা

ভূমিকা

১৯৮৮ সালের ১৭ মার্চ ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ২০০২ সালে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০ সালে। বুড়িমারী স্থলবন্দরটি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত। আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ অনুযায়ী বুড়িমারী স্থলবন্দরটি বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম স্থলবন্দর।

টিআইবি দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবির মূল লক্ষ্য গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পথে প্রতিবন্ধকতাকে গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং এর ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এর আগে বিভিন্ন সময়ে টিআইবি দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম চালিকাশক্তি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও কাস্টম হাউস, বেনাপোল স্থলবন্দর ও কাস্টম হাউস, টেকনাফ স্থলবন্দর ও বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা উত্তরণের উপায় নির্ধারণে গবেষণা পরিচালনা করেছে।[১]

এরই ধারাবাহিকতায় বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের ওপর ২০০৯ সালে পরিচালিত গবেষণার একটি ফলোআপ গবেষণা হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করার লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

---

* ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের অবকাঠামো ও জনবল

বুড়িমারী স্থলবন্দরের মোট আয়তন ১১ দশমিক ১৫ একর। দোতলাবিশিষ্ট নিজস্ব একটি প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। ওই প্রশাসনিক ভবনে স্থলবন্দরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শুল্ক স্টেশন, শুল্ক গোয়েন্দা ও ইমিগ্রেশনের কার্যাবলি সম্পাদন হচ্ছে। বুড়িমারী স্থলবন্দরে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন।[২] বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনে একজন সহকারী কমিশনারের নেতৃত্বে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। কাস্টমসে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পদ (৩৪টি) শূন্য রয়েছে।[৩] সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বন্দর ব্যবহারকারীদের মতে, বর্তমানে এই বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্যের (১৮টি) আমদানি নিষিদ্ধ থাকায় বিদ্যমান জনবল ঘাটতির কারণে কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা হয় না। বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশন ও বন্দরে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থল শুল্ক স্টেশনে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৬৮ দশমিক ৫৭ কোটি টাকা[৪] এবং স্থলবন্দরে রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা[৫], যা এযাবৎ কালের সর্বোচ্চ।

বুড়িমারী বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি

বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। নিচে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন আলোচনা করা হলো।

বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির বিভিন্ন পর্যায়ে বুড়িমারী কাস্টমস ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র এবং পণ্যের ধরন, গুণগত মান, ওজনসহ সবকিছু সঠিক থাকা সত্ত্বেও পণ্যছাড়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অলিখিতভাবে নির্ধারিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। তবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পণ্যের মান, ধরন বা ওজনে সমস্যা থাকলে, অথবা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ, উভয় পক্ষের স্বার্থ বিবেচনায় পরস্পরের দর-কষাকষির সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বুড়িমারী বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে বিল অব এন্ট্রিপ্রতি গড়ে ন্যূনতম ২ হাজার ৫০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে বা ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। একইভাবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে বিল অব এক্সপোর্টপ্রতি গড়ে ন্যূনতম ১ হাজার ৭০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়।[৬] বর্তমান গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ সালে নিয়মবহির্ভূতভাবে ন্যূনতম প্রায় ২ দশমিক ৮৫ কোটি টাকা জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

অন্যদিকে একই সময়ে বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃক আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রায় শূন্য দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষের আপসে আদায় করা নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন সম্ভব হয়নি।

সারণি-১ : ২০১৬-১৭ সালে বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন কর্তৃক আদায় করা নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন

কর্তৃপক্ষ	ধরন	বিওই সংখ্যা (২০১৬-১৭ সাল)	ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার	আদায় করা মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
শুল্ক স্টেশন	আমদানি	১৪৩১৫	১৭৫০	২.৫১
	ওপ্তানি	২২৭৯	১৫০০	০.৩৪
		মোট পরিমাণ		২.৮৫
স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	আমদানি	১৪৩১৫	৩০০	০.৪৩
	ওপ্তানি	২২৭৯	২০০	০.০৫
		মোট পরিমাণ		০.৪৮

উৎস : এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে পরিচালিত মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন

উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ

বিভিন্ন উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র থেকে অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে পণ্যভিত্তিক নির্ধারিত ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও ঘুষ হিসেবে ফলের ট্রাকপ্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা এবং বীজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।[৭] কিছু ক্ষেত্রে পণ্যের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সারণি-২ : ২০১৭-১৮ সালে আদায় করা ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন

ট্রাকের সংখ্যা	ট্রাকপ্রতি নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ	আদায় করা মোট নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
৮৫৫০টি	২০০ টাকা	১৭.১০ লাখ টাকা

উৎস : এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে পরিচালিত মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন

শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে ওজনে ফাঁকি দেওয়া

বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে ওজন কম দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ওজন ফাঁকি দেওয়া হয় ফল ও মসলা (এলাচি বা জিরা) আমদানির ক্ষেত্রে। এ ছাড়া পাথরের ক্ষেত্রেও ট্রাকপ্রতি ২-৪ টন ওজন কম দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

পণ্য লোডিং ও আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্তৃক জোরপূর্বক বকশিশ আদায়

বুড়িমারী স্থলবন্দর মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রাকে পণ্য লোডিং ও আনলোডিং করার জন্য ব্যবসায়ীদের বন্দরনির্ধারিত ফি জমা দিতে হয়, যা টনপ্রতি ৯৯ টাকা। কিন্তু পরে পণ্য লোড-আনলোড করার সময় শ্রমিকদের ট্রাকপ্রতি ২০০-৫০০ টাকা অতিরিক্ত অর্থ বকশিশ হিসেবে দিতে হয়। এই বকশিশ না দিলে অযথা সময়ক্ষেপণ, অযত্নের সঙ্গে পণ্য হ্যান্ডলিংসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়।[৮]

আন্তজেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

বুড়িমারী স্থলবন্দর থেকে আমদানি পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের জন্য ট্রাক ভাড়া করার ক্ষেত্রে বুড়িমারী ট্রাক টার্মিনালে মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ট্রাকপ্রতি প্রায় ৯০০ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করে থাকে। দালালের সাহায্য ছাড়া বুড়িমারী থেকে ট্রাক ভাড়া পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে দালালকে ট্রাকপ্রতি ৪০০-৫০০ টাকা বকশিশ দিতে হয়।[৯]

বর্তমান গবেষণায় পাওয়া তথ্যমতে, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০টি হিসাবে বছরে গড়ে প্রায় ৬ হাজারটি পণ্যবাহী ট্রাক এই টার্মিনাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহন করে[১০]। এই হিসাবে প্রাক্কলনে দেখা যায়, প্রতিবছর এই টার্মিনাল থেকে ন্যূনতম প্রায় ৫ দশমিক ৪ কোটি টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়।

২০০৯ সালের সঙ্গে ২০১৭ সালের তুলনা

অবকাঠামোগত পরিবর্তন : ২০০২ সালে বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলেও, তখন পর্যন্ত বন্দরের কোনো কর্তৃপক্ষ বা কার্যক্রম ছিল না। কোনো ওয়্যার হাউস ছিল না, ওয়ে ব্রিজ ছিল না। ২০০৯ সালের গবেষণায় দেখা যায়, বন্দর অবকাঠামো না থাকার ফলে পণ্যের ওপর কাস্টম্স ও বন্দরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে বেসরকারি ওয়্যার হাউসে পণ্য রাখতে হতো। এতে পণ্যের ধরন, গুণগত মান ও ওজন পরিবর্তিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। নিয়মবহির্ভূতভাবে স্পট রিলিজ, একই এলসির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচার এবং ব্যাপক মাত্রায় ওজনে ফাঁকির অভিযোগ ছিল।[১১]

২০১০ সালে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। নিজস্ব ওয়্যার হাউস, ওয়ে ব্রিজ চালু এবং এর ফলে পণ্যের ওপর শুল্ক স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায় ও স্পট রিলিজ,

একই এলসির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচার বন্ধ হয়। ওজন ফাঁকির পরিমাণ ও অভিযোগও কমেছে।[১২]

আগে বুড়িমারীতে ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখা না থাকার ফলে আমদানিকারককে এলসি খুলতে হলে এবং চেক বা টিটি, ডিডির মাধ্যমে শুল্ক জমা দিতে হলে ১৫ কিমি দূরে পাটগ্রামে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় যেতে হতো। এতে শুল্ক জমা দিতে হয়রানি ও সময়ক্ষেপণ হতো এবং ব্যাংক দূরে থাকায় ট্রেজারি চালান জাল হতো।[১৩] বর্তমানে বুড়িমারী বাজারেই জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি করে পূর্ণাঙ্গ শাখা থাকার কারণে যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে বন্দরেই।

যোগাযোগব্যবস্থার পরিবর্তন : আগে ঝুঁকিপূর্ণ রেললাইনের জন্য প্রতি মাসে গড়ে ৯টি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হতো। ট্রেন ঘণ্টায় মাত্র ১৫ কিমি বেগে চলায় বুড়িমারী থেকে লালমনিরহাট পর্যন্ত পৌঁছাতে ৫-৬ ঘণ্টা এবং রংপুর পৌঁছাতে ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগত। বর্তমানে রেলপথের প্রয়োজনীয় সংস্কার হওয়ায় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা বিরল। ফলে লালমনিরহাটে এবং রংপুরে বসবাসরত ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে।

শুল্ক স্টেশনে পরিবর্তন : ২০০৯ সালে শুল্ক স্টেশনে ডিজিটাল সফটওয়্যার ছিল না। ফলে মিস ডিক্লারেশন, আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিংয়ের সুযোগ ছিল এবং শুল্ক বাকি রেখেও পণ্য ছাড় করা হতো। পরে অনেক ক্ষেত্রে বকেয়া শুল্ক উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। বর্তমানে শুল্ক স্টেশনে অ্যাসাইকোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার চালু হয়েছে এবং এর ফলে মিস ডিক্লারেশন ও আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং প্রায় বন্ধ হয়েছে। এখন শুল্ক পরিশোধ না করে পণ্য ছাড়ের সুযোগ নেই। তবে এখনো পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হয়নি। তবে আগের মতোই এখনো পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়।

অন্যান্য পরিবর্তন : ২০০৯ সালে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রে পণ্য পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি না থাকায় কৃষিজাত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল পরীক্ষণ ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না। উপরন্তু, পণ্যের পরীক্ষণ না করা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য পরীক্ষণ ফি দিতে হতো। বর্তমানে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে সাব-টেক্স মেশিন, সুইজারমিনেটর মাইক্রোস্কোপ, সিড কাউন্টার মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রয়েছে। তবে ফরমালিন টেস্ট করার জন্য কোনো যন্ত্রপাতি নেই। পণ্য পরীক্ষণের জন্য কোনো প্যাথলজিস্ট নেই।

উপসংহার

২০১০ সালে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে পণ্যের শুল্কায়ন ছাড়াই স্পট রিলিজ বা পণ্যভর্তি ট্রাক পাচার, একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচারের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি-সংক্রান্ত বড় ধরনের

অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শুল্ক স্টেশনের ডিজিটালাইজেশন সত্ত্বেও পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড়ে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ বিদ্যমান।

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বন্দরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশ ভিন্ন এখানে অনিয়ম বা দুর্নীতি সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, অসাধু ব্যবসায়ী ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের ঘুষের প্রলোভন এবং দুর্বল ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান দায়ী।

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সচেতন নাগরিক সমাজ সক্রিয় ও সংগঠিত ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব হয়ে ওঠে না। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সরকারের ব্যর্থতার কারণেও স্থানীয় নাগরিক সমাজ এ ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার অভাব, নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। সর্বোপরি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দুর্নীতিবিরোধী কার্যকর নীতি প্রণয়নে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার প্রতিনিয়ত রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং বাজারে অসম ও অসৎ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে সৎ ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে থাকেন।

সুপারিশ

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন থেকে অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে নিচে প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশ করা হলো :

১. পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বন্দর ও কাস্টমসের সব ধরনের শুল্ক ও মাশুল অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন বন্ধে বন্দর ও কাস্টমসের সম্পূর্ণ এলাকা সার্বক্ষণিকভাবে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে এবং সবার জন্য দৃশ্যমান স্থানে মনিটর স্থাপন করতে হবে।

৪. পর্যালোচনা সাপেক্ষে জনবলকাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৫. উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে প্যাথলজিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। পণ্যের যথাযথ পরীক্ষণ সাপেক্ষে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে শ্রমিক কর্তৃক বকশিশ নামক চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।
৭. মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক চাঁদা আদায় বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদারকি বাড়াতে হবে।
৮. বন্দরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
৯. ভারত ও ভুটানের বিভিন্ন পণ্যের শুল্কহারসহ আমদানি-রপ্তানি-প্রক্রিয়াসংবলিত তথ্যবহুল নাগরিক সনদ স্থাপন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] সাইদুর রহমান মোল্ল্যা, 'ডায়াগনস্টিক স্টাডি : চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৪); সাইদুর রহমান মোল্ল্যা, 'ডায়াগনস্টিক স্টাডি : বেনাপোল ও টেকনাফ স্থলবন্দর', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৬); তানভীর মাহমুদ ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা : ফলোআপ ডায়াগনস্টিক স্টাডি', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৭); তানভীর মাহমুদ ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৮); মনজুর-ই-খোদা ও জুলিয়েট রোজেটি, 'চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৪); মনজুর-ই-খোদা ও মাহমুদ হাসান তালুকদার, 'বুড়িমারী স্থলবন্দরের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম : উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০০৯)।

[২] বন্দর কর্তৃপক্ষ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৩] কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৪] *প্রাগুক্ত*।

[৫] বন্দর কর্তৃপক্ষ, *প্রাগুক্ত*।

[৬] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৭] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৮] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৯] কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, *প্রাগুক্ত*।

[১০] *প্রাগুক্ত*।

[১১] মনজুর ই খোদা ও মাহমুদ হাসান তালুকদার, ২০০৯।

[১২] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, এপ্রিল ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[১৩] মনজুর ই খোদা ও তালুকদার, ২০০৯।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

জাফর সাদেক চৌধুরী

ভূমিকা

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবন্দর এবং এটির দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে অবস্থান হওয়ায় বিমানবন্দর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। নব্বইয়ের দশকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর পর এটি ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। গত দুই দশকে এই বিমানবন্দরের যাত্রী ও ফ্লাইটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৪ গুণ এবং ফ্লাইটের সংখ্যা বেড়েছে ৩ দশমিক ১৫ গুণ। চট্টগ্রাম একটি প্রবাসী নিবিড় জেলা। ২০০৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রবাসী কর্মসংস্থানের দিক থেকে চট্টগ্রাম জেলার অবস্থান বাংলাদেশে দ্বিতীয়, এ সময় চট্টগ্রাম জেলার মোট ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৬ জন কর্মী প্রবাসে কর্মসংস্থান লাভ করেছেন।[১] চট্টগ্রাম এবং এর পাশাপাশি কয়েকটি জেলার প্রবাসী যাত্রীরা যাতায়াতের জন্য এ বিমানবন্দরের ওপর নির্ভরশীল। বিমানবন্দরের আশপাশে তিনটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের অবস্থানের কারণে এই বিমানবন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মধ্যপ্রাচ্য-দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৯টি আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রীদের সেবা প্রদান করছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রুটেও যাত্রীসেবা দিচ্ছে। স্বল্প পরিসরে কার্গো পরিবহনসেবাও দিচ্ছে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ বিমানবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিমানবন্দরের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রীসেবা প্রদানের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। যাত্রীসংখ্যার পাশাপাশি ফ্লাইটসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রও সুস্পষ্ট। বর্তমানে এ বিমানবন্দর দৈনিক ২০-২৫টি বিমানকে উড্ডয়ন ও অবতরণে সেবা দিচ্ছে। সাতটি দেশে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল করে : ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি

*২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

আরব ও ওমান। পাঁচটি বিদেশি এবং চারটি দেশি এয়ারলানস এই বিমানবন্দর ব্যবহার করছে। ২০০০ সালে ২ লাখ ৫২ হাজার ৯৬৫ জন যাত্রী এই বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। ২০১৫ সালে বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন ১১ লাখ ৭০ হাজার ৩০৩ জন যাত্রী; অর্থাৎ যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ দশমিক ৬২ গুণ। ২০১৬ সালে এ বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩১৫ জন যাত্রী; যা ছিল ২০১৫ সালের তুলনায় ৬ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি। সারণি ১-এ যাত্রী প্রবৃদ্ধির চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি ১ : যাত্রী ও ফ্লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	ফ্লাইটের সংখ্যা	যাত্রীর সংখ্যা
২০০০	৬,৭৫৯	২,৫২,৯৬৫
২০১৪	১৭,০৮৬	১০,৬৫,৬৯০
২০১৫	১৯,২৩৪	১১,৭০,৬৪৩
২০১৬	২১,২৯৫	১২,৫০,৩১৫

সেবার পরিধি ও ব্যপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, কার্যক্রমে ধীরগতি, পুশকার্ট, বোর্ডিং ব্রিজ, ফর্ক লিফট-সংকট, প্রবাসীদের ভারী লাগেজ বহনে সমস্যা, লাগেজ লাপাত্তা, শুল্ক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মীদের একাংশ কর্তৃক যাত্রী হয়রানি–এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।[২] যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধির জন্য কিছু ইতিবাচক উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে। যেমন অত্যাধুনিক রাডার স্থাপন, উন্নত নিরাপত্তাসামগ্রীর ব্যবহার, সচেতনতার জন্য স্থানীয় কেব্‌ল টিভিতে বিজ্ঞাপন প্রচার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। এতদসত্ত্বেও বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কর্মী কর্তৃক যাত্রীদের হয়রানি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ আদায়ের ঘটনাও ঘটছে।[৩]

গবেষণার উদ্দেশ্য

শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রীসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা এ গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- যাত্রীসেবায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা;
- যাত্রীদের সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- যাত্রীসেবা কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণাপদ্ধতি ও পরিধি

গবেষণাটি মূলত গুণগত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো–প্রাসঙ্গিক নথি, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ তথ্য–মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (যাত্রী, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য অংশীজন) কিংবা বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ। যেমন প্রবেশ, পার্কিং, নিরাপত্তা চেক, ইমিগ্রেশনসেবা, শুল্কসেবা-বিষয়ক বাস্তবতা আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে যে অনিয়মের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিমানবন্দরের বিভিন্ন সংস্থা; যেমন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (বেবিচক), ইমিগ্রেশন, শুল্ক, নিরাপত্তা বিভাগের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এমনকি এখানে অনিয়মকে সাধারণীকরণও করা হচ্ছে না; বরং সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অব্যবস্থা, চ্যালেঞ্জের একটি চিত্র প্রদান করবে। এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয় এপ্রিল ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সাল পর্যন্ত। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ক্ষেত্রে ২০১৪-২০১৬ সালের তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য

অবকাঠামো : ১৯৭২ সালে স্বল্প পরিসরে একটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে এই বিমানবন্দর দিয়ে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের সংযোগ স্থাপিত হলেও ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রা শুরু হয়।

সারণি ২ : বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত তথ্য

মোট ভূমি	৬৬৫.২৭৪ একর
মোট ভবন	১৮টি
মূল টার্মিনাল ভবন	১৮,৬০০ বর্গমিটার
কার্গো ভবন	২,৭০০ বর্গমিটার
রানওয়ে	৯৬৪০ফিট × ১৫০ ফিট
পার্কিং এরিয়া (এয়ার ক্রাফট)	১২৮৭ ফিট × ৪৩৩
কার পার্কিং সক্ষমতা	৪০০ কার
যাত্রীর সক্ষমতা	৬ লাখ
কার্গোর সক্ষমতা	৫৭ হাজার মেট্রিক টন

১৯৯৮ সালে জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় চিটাগাং এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (সিএডিপি) কাজ শুরু হয়। ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।[৪] এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিমানবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পন্ন হয়। বর্তমানে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবকাঠামো ব্যবহার করছে তা এ প্রকল্পের মাধ্যমেই গড়ে তোলা হয়। সারণি ২ বিমানবন্দরের অবকাঠামোর চিত্র দেখানো হয়েছে।

লোকবল : বিমানবন্দরের কাজের পরিধি, যাত্রী ও ফ্লাইটের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়লেও চাহিদা অনুযায়ী লোকবল বাড়েনি। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশোধিত অর্গানোগ্রাম প্রস্তাব করলেও তা এখনো নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে নিয়মিত নিয়োগ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে, কিছু নিয়োগের ব্যাপারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিমানবন্দর সেবা কার্যক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। ১৯৮৮ সালের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৩১৫ জন লোকবল দিয়ে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাজ পরিচালনা করছে। লোকবল স্বল্পতার কারণে যাত্রীসেবা কার্যক্রমে মন্থরতা লক্ষণীয়।

গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি : শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যোগাযোগ ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম সচল এবং পর্যাপ্ত আছে। তবে নিরাপত্তা সরঞ্জাম আরও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখনো অনেক কাজ ম্যানুয়ালি করতে হয়। কারণ বিমানবন্দরের অনেক যন্ত্রপাতি আধুনিক প্রযুক্তির নয়। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তাব্যবস্থায় আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম যুক্ত করা হয়েছে। আগে সিঙ্গেল ভিউ স্ক্যানার ব্যবহৃত হতো, এখন ডুয়াল ভিউ স্ক্যানার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে স্ক্যানিংয়ে আরও নিখুঁত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক রাডার।

নিরাপত্তা : তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। স্তরগুলো হচ্ছে প্রাথমিক নিরাপত্তা, মাধ্যমিক নিরাপত্তা, চূড়ান্ত নিরাপত্তা। নিরাপত্তার কাজ সিভিল এভিয়েশন নিরাপত্তা বিভাগ সমন্বয় করে। সিভিল এভিয়েশনকে সহযোগিতা করার জন্য আনসার বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন। নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিমানবন্দরে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) মোতায়েন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক ডগ স্কোয়াড পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্রাউন্ড সাপোর্ট : গ্রাউন্ড সাপোর্টে[৫] যন্ত্রপাতি অপর্যাপ্ত, যন্ত্রপাতির ৩৭ শতাংশের বেশি যন্ত্রপাতি আংশিক ব্যবহারোপযোগী এবং ২৪ শতাংশের বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগী নয়। অনেক সময় একটি বিমানের সরঞ্জাম দিয়ে দুটি বিমানকে সেবা দিতে হয়। ফলে যাত্রীসেবা কার্যক্রমে মন্থর গতি দেখা যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির ঘাটতির কারণে গ্রাউন্ড সাপোর্টে মালামাল ব্যবস্থাপনার কাজ এখনো ম্যানুয়ালি করতে হয়। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের

গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব পালন করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ২০-২৫ বছরের পুরোনো। সারণি ৩-এ গ্রাউন্ড সাপোর্ট সরঞ্জামের আংশিক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৩ : গ্রাউন্ড সাপোর্ট সরঞ্জামের চিত্র

ক্রমিক নং	যন্ত্রের নাম	মোট	ভালো	সমস্যাগ্রস্ত	ব্যবহারের অনুপযোগী
১	টো ট্রাকটর	৪	২	২	০
২	পুশকার্ট	২	০	২	০
৩	স্টার্ট কার্ট	২	১	১	০
৪	গ্রাউন্ড পাওয়ার	৩	২	০	১
৫	কনটেইনার প্লেট লোডার	৩	০	২	১
৬	ফ্লাশ কার্ট	২	০	১	১
৭	এ/সি ভ্যান	১	০	০	১
৮	প্যাসেঞ্জার স্টেপ	৪	২	১	১
৯	ফর্ক লিফট	২	১	০	১
১০	বেল্ট লোডার	৪	২	১	১
১১	ওয়াটার কার্ট	২	১	১	০
১২	র‍্যাম্প কোচ	১	১	০	০

তথ্যসূত্র : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ২০১৮।

চেক-ইন কাউন্টার : ইন্টারন্যাশনাল রুটের জন্য ১০টি চেক-ইন কাউন্টার রয়েছে। অভ্যন্তরীণ রুটের জন্য রয়েছে সাতটি। একই সময়ে একাধিক এয়ারলাইনসের বিমান উড্ডয়ন কিংবা অবতরণ নির্ধারিত থাকলে এয়ারলাইনসগুলোকে কাউন্টারগুলো যৌথভাবে ব্যবহার করতে হয়, ফলে কাউন্টারের স্বল্পতা দেখা দেয়। কাউন্টার স্বল্পতার জন্য কাউন্টার কর্মীদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে। কাউন্টারে যাত্রীদের দীর্ঘ সারি হয় এবং সেবা পেতে দেরি হয়।

লাউঞ্জ : সাধারণ যাত্রীদের জন্য কোনো লাউঞ্জ নেই। চারটি ভিআইপি এবং দুটি সিআইপি লাউঞ্জ রয়েছে। লাউঞ্জগুলোতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা নেই। সিআইপি লাউঞ্জে কোনো টেলিভিশন নেই। ভিআইপি লাউঞ্জে পুরোনো টেলিভিশন রয়েছে। নেই যাত্রীদের পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ যাত্রীদের জন্য একটি বেসরকারি ব্যাংক একটি লাউঞ্জ করেছে।

পার্কিং : শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সুপরিসর পার্কিং এরিয়া রয়েছে। এতে প্রায় ৪০০ গাড়ি পার্ক করার ক্ষমতা রয়েছে। পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত ফি দিতে হয়। একটি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডারের মাধ্যমে পার্কিংয়ের ইজারা দেওয়া হয়েছে। পার্কিং এরিয়া একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দরে যাত্রীসেবায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

প্রবেশ : বিমানবন্দরের প্রধান প্রবেশ ফটকে যাত্রী ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট অতিক্রম করে যেতে হয়। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা চেকপয়েন্টে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকেন। বিমানবন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে দর্শনার্থী সংখ্যার উল্লেখ নেই। দর্শনার্থীদের প্রবেশ ফির নিয়ম না থাকায় যাত্রীর সঙ্গে দর্শনার্থী থাকলে আনসার ও এপিবিএন সদস্যদের একাংশ দর্শনার্থীদের টার্মিনাল ভবনে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৫০০ টাকা আদায় করা হয়। প্রভাবশালী যাত্রীর দর্শনার্থীরা অনেক সময় মিছিলসহকারে বিমানবন্দর এলাকায় প্রবেশ করেন এবং টার্মিনাল ভবনসহ বিমানবন্দর এলাকায় সেবা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন।

নিরাপত্তা চেক ও মালামাল স্ক্যান : যাত্রীদের অসচেতনতার জন্য অনেক সময় হ্যান্ডব্যাগে বা কেবিন ব্যাগেজে[৬] পরিবহনযোগ্য নয় এমন পণ্য থেকে যায়। যেসব বস্তু কেবিন ব্যাগেজে পরিবহন করা যায় না তা পরিবহনের জন্য যাত্রীরা চেকড ব্যাগেজ[৭] ব্যবহার করেন। ধাতব বস্তু (কাঁচি, আয়রন ইত্যাদি) ও পচনশীল বস্তু (শুঁটকি, ফল-মূল, রান্না করা খাবার, কাঁঠাল ইত্যাদি) কেবিন ব্যাগে বহন নিষিদ্ধ হলেও সিভিল এভিয়েশন নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীদের একাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে পরিবহনের সুযোগ করে দেন। এ ক্ষেত্রে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আদায় করা হয়। যাত্রীদের ধাতব ও পচনশীল বস্তু বহনের ফলে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার নিয়ম লঙ্ঘন হয়, বিমানবন্দর এবং বিমানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

চেক-ইন ও বোর্ডিং পাস সংগ্রহ : একই সময়ে একাধিক এয়ারলাইনসের বিমান উড্ডয়ন নির্ধারিত থাকলে এয়ারলাইনসগুলোকে আন্তর্জাতিক রুটের ১০টি কাউন্টার যৌথভাবে ব্যবহার করতে হয়। চাহিদার তুলনায় কাউন্টারের স্বল্পতা দেখা যায়। কাউন্টার স্বল্পতার জন্য এর কর্মীদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে। ফলে কাউন্টারে যাত্রীদের দীর্ঘ সারি হয় এবং সেবা পেতে দেরি হয়। এয়ারলাইনসের কর্মীদের অধিকসংখ্যক লোককে দ্রুততার সঙ্গে সেবা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সেবার মানের বিচ্যুতি ঘটে। যাত্রীসংখ্যা বেশি হলে তাদের সেবা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ১৫-২০ মিনিট।

বহির্গমন কার্ড পূরণ : বিমানবন্দর ত্যাগের আগে প্রত্যেক যাত্রীকে বহির্গমন কার্ড পূরণ করতে হয় এবং ইমিগ্রেশন ডেস্কে তা জমা দিতে হয়। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী অধিকাংশ যাত্রী প্রবাসী শ্রমিক। প্রবাসী শ্রমিক যাত্রীরা অনেকেই বহির্গমন কার্ড পূরণ করতে পারেন না। যাত্রীদের বহির্গমন কার্ড পূরণে সহায়তার জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো

ব্যবস্থা নেই। বিমানবন্দরে সেবাপ্রদানকারী সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিষ্ঠানের (সিভিল এভিয়েশন, ইমিগ্রেশন, বিভিন্ন এয়ারলাইনস ইত্যাদি) কর্মীদের একাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এ কার্ড পূরণ করেন। এ ক্ষেত্রে ৫০-১০০ টাকা আদায় করা হয়।

ইমিগ্রেশন : একাধিক ফ্লাইট একই সময়ে অবতরণ করলেও স্বল্পসংখ্যক বুথ সচল থাকে। ফলে যাত্রীদের সেবা পেতে দেরি হয়। ইমিগ্রেশন সেবা নেওয়ার সময় সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভিজিট ভিসার মাধ্যমে যেসব যাত্রী শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছেন, তাদের নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে ইমিগ্রেশনের কর্মীদের একাংশ ইমিগ্রেশন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে ৩০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা আদায় করা হয়। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে মধ্যপ্রাচ্যগামী একটি ফ্লাইটের ১৪ জন যাত্রী রোহিঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত এবং তাদের আটক করা হয়। ভিজিট ভিসার কোনো কোনো যাত্রীর বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের হয়রানি এবং অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। ভিসার মেয়াদ কম, ছবি ঠিক নেই–এসব অজুহাতেও মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী যাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এ ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা আদায় করা হয়।

চূড়ান্ত নিরাপত্তা চেক : ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র নেওয়ার পর যাত্রীদের লাগেজ পুনরায় স্ক্যানিং করা হয়। যাত্রীরা অনেক সময় অনুমোদিত মুদ্রার থেকে বেশি পরিমাণ দেশি ও বিদেশি উভয় ধরনের মুদ্রা বহন করেন। এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে নিরাপত্তাকর্মীদের একাংশ কর্তৃক অনেক যাত্রীর সঙ্গে থাকা অতিরিক্ত মুদ্রা (১০০ টাকা বা ২৫ ইউএসডির অধিক) জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এই অতিরিক্ত মুদ্রা আটকের এখতিয়ার কাস্টমস কর্মকর্তাদের রয়েছে।

বোর্ডিং লাউঞ্জ : বোর্ডিং লাউঞ্জে যাত্রীরা নির্ধারিত ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করেন। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের বসার পর্যাপ্ত চেয়ার রয়েছে। লাউঞ্জের বাইরে দুটি খাবারের দোকান রয়েছে। খাবারের মূল্য বাইরের তুলনায় বেশি, মূল্যতালিকা রয়েছে। খাবারের দোকান ছাড়াও দুটি ডিউটি ফ্রি দোকান রয়েছে। ডিউটি ফ্রি দোকানের প্রধান পণ্য অ্যালকোহল। তবে পর্যটন করপোরেশানের ডিউটি ফ্রি একটি দোকানে অ্যালকোহল ছাড়াও কিছু হস্তশিল্পের পণ্য রয়েছে। অধিকাংশ যাত্রীই মনে করেন খাবারের দোকানে মূল্য স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য বোর্ডিং লাউঞ্জের বাইরে নারী ও পুরুষ যাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে। টয়লেটের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যবহারকারীরা সন্তুষ্ট। তবে টয়লেট সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সচেতনতামূলক উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ফলে মাঝে মাঝে টয়লেট অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিমান উড্ডয়নের আগে বোধগম্য ভাষায় যাত্রীদের বিমানে ওঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।

ব্যাগেজ সংগ্রহ : আগমনের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে যাত্রীকে ব্যাগেজ রিক্লেইম করতে হয়। নির্দিষ্ট কনভেয়ার বেল্ট থেকে নিজের ব্যাগ খুঁজে নিতে হয়। অনেক সময় ব্যাগেজ পেতে দেরি হয়। যন্ত্রপাতি ঘাটতির কারণে অনেক সময় কিছু কাজ ম্যানুয়ালি করতে

হয়। তখন যাত্রীর ব্যাগ আসতে দেরি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫-৩০ মিনিটের মধ্যে সব যাত্রী ব্যাগেজ পেয়ে যান। একটি এয়ারলাইনসের ল্যান্ডিংয়ের সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বিমান অবতরণ করে ১১.০৫ মিনিটে এবং প্রথম যাত্রী ব্যাগেজ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ১১.২৬ মিনিটে।

শুল্ক সেবা : শুল্ক বিভাগ মূলত শুল্ক নির্ধারিত শুল্কায়ন পণ্য, বৈধ পণ্যের আনয়ন চেকিং, মানি ডিকলারেশন–এসব বিষয় চেক করে থাকে। সে কারণে সন্দেহজনক ব্যক্তির লাগেজ এবং শরীর তল্লাশি, আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ করে থাকেন। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক কর আদায় করে থাকেন। যেসব যাত্রী শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্য সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, তারা শুল্ক বিভাগের নির্ধারিত ফরমে তাদের পণ্যের ঘোষণা দিয়ে থাকেন। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী যাচাই করে শুল্ক কর্মকর্তারা শুল্ক আদায় করেন। শুল্ক বিভাগে ১৩৯ জন কর্মীর বিপরীতে ২৯ জন কর্মী কর্মরত রয়েছেন, ১১০টি পদ শূন্য। লোকবল ঘাটতির কারণে সেবায় মন্থর গতি, নারী কর্মীর সংখ্যা মাত্র একজন। ফলে নারী যাত্রীদের চেকিংয়ে সমস্যা হয়। শুল্কযোগ্য পণ্যের ধরন, শুল্কের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু যাত্রীর ধারণা ও সচেতনতার ঘাটতি লক্ষণীয়। শুল্ক বিভাগের কর্মীদের একাংশের সহায়তায় নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য (মদ, তামাকজাত পণ্য) অথবা শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (টিভি, সোনার বার, মোবাইল, শাড়ি) শুল্ক ফাঁকি দিয়ে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২ হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা আদায় করা হয়।

বাহির ও পার্কিং : টার্মিনাল ভবনের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মীরা যাত্রীর ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করেন। যাত্রীদের সামান্য সহযোগিতা করে (সিএনজি ঠিক করে দেওয়া, মালামাল একটু এগিয়ে দেওয়া) বকশিশ দাবি করেন। বকশিশ হিসেবে বাংলাদেশি টাকা নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ এবং জোরপূর্বক বিদেশি মুদ্রা আদায় করেন। কিছু ক্ষেত্রে যাত্রীর মালামাল লুকিয়ে রেখে বকশিশ আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ১ হাজার টাকা আদায় করা হয়। নির্ধারিত ফির বিনিময়ে পার্কিং এলাকায় গাড়ি পার্ক করা যায়। যেমন সিএনজিচালিত অটোরিকশার ক্ষেত্রে ২৫ টাকায় তিন ঘণ্টা অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সময় পার্কিং স্থান ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে ফি দিতে হয়। পার্কিং এলাকায় একটি মধ্যস্বত্বভোগী চক্র বিদ্যমান, এই চক্র যাত্রী এবং ভাড়া ঠিক করে দিয়ে সিএনজিচালকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। ফলে যাত্রীদের অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া দিতে হয়। স্থানীয় সিএনজিচালকদের সিন্ডিকেটের আধিপত্যের কারণে প্রবাসী যাত্রীদের অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়।

লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড : লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড থেকে ব্যাগেজ গ্রহণের সময় যাত্রীরা কখনো কখনো ব্যাগের তালা ভাঙা পান এবং ব্যাগের পণ্য হারানো যায়। পাসপোর্ট ছাড়াও অবৈধ অর্থের বিনিময়ে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড থেকে ব্যাগ পাওয়া যায়। যেমন একজন যাত্রী ব্যাগেজ গ্রহণ করতে

যাওয়ার সময় সঙ্গে পাসপোর্ট নিয়ে না গেলেও দায়িত্বরত কর্মীকে ৫০০ টাকা প্রদান করে ব্যাগেজ বুঝে পাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেক সময় যাত্রীরা ব্যাগেজ প্রাপ্তির সময়সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পান না। যেমন একজন যাত্রীকে তার ব্যাগেজ গ্রহণ করার জন্য চার দিন বিমানবন্দরে যেতে হয়েছে। ওয়্যার হাউস ছোট হওয়ায় বাইরে ব্যাগেজ রাখতে হয়। এতে মালামালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

বোর্ডিং ব্রিজ : শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দুটি বোর্ডিং ব্রিজ আছে। দুটি বোর্ডিং ব্রিজ থাকার ফলে একই সময়ে চাহিদা থাকলেও দুইয়ের অধিক বিমানে বোর্ডিং ব্রিজ সংযোজন করা যায় না। দেশীয় বেসরকারি এয়ারলাইনসগুলো টাকা সাশ্রয়ের জন্য বোর্ডিং ব্রিজ ব্যবহার করে না। ফলে যাত্রীদের র‍্যাম্প থেকে হেঁটে আসতে হয়। র‍্যাম্প কোচ বা বাসের অপর্যাপ্ততার ফলে যাত্রীর ব্যাগেজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং ব্যাগেজ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা : দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করার কোনো জায়গা নেই। কার পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। রোদ, বৃষ্টিতে দর্শনার্থীরা ভোগান্তির শিকার হন। যাত্রীদের স্বজনরা টার্মিনাল ভবনের বাইরে খোলা জায়গায় অবস্থান করেন।

পরিচ্ছন্নতা : একটি বেসরকারি সংস্থাকে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিমানবন্দরের বিভিন্ন ভবনের পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত আছেন। বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত টয়লেটগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। তবে সচেতনভাবে টয়লেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রচারণামূলক উদ্যোগের ঘাটতি এবং অতিরিক্ত যাত্রী চলাচলের সময় টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

সময় ব্যবস্থাপনা : শাহ্ আমানত বিমানবন্দরের ফ্লাইটের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর সময়ের মধ্যে যাত্রীসেবা প্রদান করতে হয়। বিমান অবতরণের ১৫ মিনিটের মধ্যেই কনভেয়ার বেল্টে লাগেজ আসা শুরু করে। ইমিগ্রেশন ও শুল্কের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া খুব বেশি সময় লাগে না। তাই একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণের পর ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের ভেতর যাত্রীরা বিমানবন্দর ত্যাগ করতে সক্ষম হন। অভ্যন্তরীণ যাত্রীদের ক্ষেত্রে যেহেতু শুল্কসেবা এবং ইমিগ্রেশন চেক নেই, সেহেতু তারা আরও দ্রুত বিমানবন্দর ত্যাগ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য ডেস্ক : অভিযোগ জানানোর পদ্ধতিসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি লক্ষণীয়। অভিযোগের কোনো দলিল সংরক্ষণ করা হয় না। কোনো অভিযোগ রেজিস্টারও নেই। অভিযোগ বাক্সগুলো দৃষ্টিগোচর স্থানে নেই। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যে তথ্য কর্মকর্তা থাকার কথা, সেই অনুযায়ী চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত বিমানবন্দরে কোনো তথ্য কর্মকর্তা নেই। কোনো তথ্য ডেস্ক নেই। ফলে একজন নবাগত যাত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়

কোনো কিছু খুঁজে পেতে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে। যেমন ফ্লাইট দেরি হলে পরিবর্তিত সময়, দেরি হওয়ার কারণ, করণীয়-সংক্রান্ত তথ্য। বয়স্ক ও অসুস্থ যাত্রীদের প্রয়োজন সাপেক্ষে হুইলচেয়ার সম্পর্কিত তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাও লক্ষণীয়।

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশক, যেমন : সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংবেদনশীলতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও ভিত্তিতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রীসেবার মান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিমানবন্দরের সক্ষমতার ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতা, প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

সারণি ৪ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্দেশক	উপনির্দেশক	চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা	• জনবল • অবকাঠামো • যন্ত্রপাতি	• দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতা • পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি • অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা • যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ত
স্বচ্ছতা	• সেবাসংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ও উন্মুক্ততা • স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ	• অভিযোগ ডেস্ক এবং অনুসন্ধান ডেস্কের অনুপস্থিতি • তথ্য কর্মকর্তার নাম ও ফোন নম্বর অপ্রকাশিত • দৃষ্টিগোচর কোনো স্থানে নাগরিক সনদের অনুপস্থিতি
জবাবদিহি	• তদারকি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা • অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	• তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা ও অভিযোগ গ্রহণের রেজিস্টারের অনুপস্থিতি • কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহির ব্যবস্থার ঘাটতি
সংবেদনশীলতা	• সেবাবান্ধব পরিবেশ • যাত্রীদের সচেতনতা	• সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের একাংশের আন্তরিকতার ঘাটতি • সেবাগ্রহীতার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ • সেবাগ্রহীতার সম্মান সুরক্ষায় উদ্যোগের অভাব
দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	• অনিয়ম, দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রক্রিয়া • দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা	• বিভিন্ন ধাপে, যেমন নিরাপত্তা, ইমিগ্রেশন, শুল্কসেবায় কিছুসংখ্যক যাত্রীর দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ • দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের একাংশের সংশ্লিষ্টতা

স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে অভিযোগ ডেস্ক ও অনুসন্ধান ডেস্কের অনুপস্থিতি; দৃষ্টিগোচর কোনো স্থানে নাগরিক সনদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিব্যবস্থার ঘাটতি; সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের একাংশের আন্তরিকতার ঘাটতি; বিভিন্ন ধাপে যেমন নিরাপত্তা, ইমিগ্রেশন, শুল্কসেবায় কিছুসংখ্যক যাত্রীর দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ; দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের একাংশের সংশ্লিষ্টতা লক্ষণীয়। সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ নিচে একনজরে উপস্থাপন করা হলো (সারণি ৪)।

যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা কার্যক্রমের সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, সেবাসংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতার ঘাটতি এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ঘাটতির ফলে বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীরা সেবাপ্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপে হয়রানির শিকার হন, অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ এবং নিয়মনিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া নিষিদ্ধ পণ্য আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টিসহ শুল্ক ফাঁকির ঘটনা ঘটে। যার প্রভাব হিসেবে সেবাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি, রাজস্ব আয় কম হওয়াসহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। নিচে বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব একনজরে দেখানো হলো (সারণি ৫)।

সারণি ৫ : বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• প্রয়োজনীয় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল, অবকাঠামো ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ততা • সেবাসংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ও উন্মুক্ততার ঘাটতি • স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের উদ্যোগের অনুপস্থিতি • কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি • তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি	• সেবাপ্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপে যাত্রী হয়রানি, অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় • আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে পর্যাপ্ত সুবিধার ঘাটতি • নিষিদ্ধ পণ্য আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টি হয় • শুল্ক ফাঁকি এবং অনিয়ম	• সেবাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানি • রাজস্ব আয় কম হওয়া • দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন

সুপারিশমালা

১. টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ, প্যারালাল ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ, নতুন বোর্ডিং ব্রিজ ক্রয় এবং তা সংযোজনের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

২. চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয়সংখ্যক চেক-ইন কাউন্টার ও ইমিগ্রেশন বুথ বাড়ানো এবং তা সক্রিয় রাখতে হবে।

৩. অধিক পণ্য ব্যবস্থাপনার জন্য লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডের ওয়্যার হাউসের আয়তন বাড়ানো এবং পণ্য ব্যবস্থাপনার তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. নিরাপত্তা ও গ্রাউন্ড সাপোর্টের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করার মাধ্যমে নিরাপত্তা, শুল্কায়ন এবং গ্রাউন্ড সাপোর্টে ম্যানুয়ালি কাজ করার হার কমিয়ে আনতে হবে, ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়া যাত্রীদের সামনে দৃশ্যমান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. পুরোনো অর্গানোগ্রাম দ্রুত সংশোধন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক লোকবল নিয়োগ করতে হবে।

৬. নিরাপত্তা তল্লাশি, ইমিগ্রেশন, শুল্কসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যাত্রী হয়রানি বন্ধ করতে তদারকি বৃদ্ধি এবং জড়িত কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করতে ন্যূনতম ফির বিনিময়ে বহির্গমন কার্ড পূরণে সহায়তা করার জন্য পৃথক ডেস্কের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. শুল্ক ফাঁকি ও নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি বন্ধ করতে শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

৯. তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে, যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য টার্মিনাল ভবনে সার্বক্ষণিক ঘোষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য (শুল্ক-সংক্রান্ত, নগদ মুদ্রা বহন, ব্যাগে বহনযোগ্য পণ্য, হুইলচেয়ার সেবা) প্রচারের জন্য দৃষ্টিগোচর স্থানে সিটিজেন চার্টার/তথ্য বোর্ড/পোস্টার টাঙাতে হবে।

১০. অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, অভিযোগ লিপিবদ্ধকরণ এবং নিষ্পত্তির রেকর্ড সংরক্ষণ করে তা নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

১১. যাত্রীর সঙ্গে দর্শনার্থীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং বিমানবন্দরের মূল গেটে দৃষ্টিগোচর স্থানে নিয়মাবলি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করার জন্য শেড নির্মাণ করতে হবে।

১২. প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভাগের (নিরাপত্তা, গ্রাউন্ড সাপোর্ট, যোগাযোগ, শুল্ক, ইমিগ্রেশন) কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. বিমানবন্দর ব্যবহারকারী এয়ারলাইনসগুলো থেকে দীর্ঘদিনের বকেয়া আদায় এবং তা বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=31(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

[২] *দৈনিক আজাদী*, ২২ অক্টোবর ২০১৫।

[৩] mzamin.com/details.php?mzamin=MzU0NzI=(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

[৪] www.caab.gov.bd/devlpmnts/cadp.html(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

[৫] গ্রাউন্ড সাপোর্ট বা হ্যান্ডলিং সেবা বলতে বোঝায় একটি বিমান এয়ারপোর্টে পার্ক করার পরবর্তী কাজ। এর ভেতর অন্যতম যাত্রীকে টার্মিনালের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেওয়া, ব্যাগেজ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেওয়া, যাত্রী বিমানে ওঠানো, পণ্য বোঝাই, পণ্য নামানো, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

[৬] যে ব্যাগেজ যাত্রীর সঙ্গে কেবিনে বহন করা যায়, তাকে কেবিন ব্যাগেজ বলা হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নিয়ম অনুযায়ী, কেবিন ব্যাগেজের ওজন হবে সর্বোচ্চ সাত কেজি। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার দৈর্ঘ্য হবে সর্বোচ্চ ১১৫ সেমি। ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইএটিএ) নিয়ম অনুযায়ী, কেবিন লাগেজের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৫৬ সেমি, প্রস্থ ৪৫ ও গভীরতা ২৫ সেমি। এই মাপের ভেতর ব্যাগেজের চাকা, পার্শ্ব পকেট এবং হাতল অন্তর্ভুক্ত।

[৭] যে ব্যাগেজ যাত্রী বিমান ভ্রমণের সময় ব্যবহার করতে পারেন না, অর্থাৎ কার্গো ক্যারিয়ারে বহন করা হয় তাকে চেকড ব্যাগেজ বলে। আইএটিএর নিয়ম অনুযায়ী, একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ২৩ কেজি ওজনের দুটো লাগেজ পরিবহন করতে পারবেন; যার পরিসীমা অনূর্ধ্ব ১৬৫ সেমি। এয়ারলাইনস অনুযায়ী, ওজনের সীমার কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ৩২ কেজির অধিক ওজন বাংলাদেশ বিমান অনুমোদন করে না।

নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*

মো. ওয়াহিদ আলম, জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, কুমার বিশ্বজিত দাশ, মোহাম্মদ নূরে আলম, নাহিদ শারমীন ও ফাতেমা আফরোজ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আধুনিক বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ব্যবহার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ব্যবহার নাগরিক সেবার প্রসার, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ম্যানুয়াল পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতা, সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, ডিজিটাল সেবা প্রদানের চাহিদা বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং এর মাধ্যমে সেবা প্রদানে সরকারকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা গতি লাভ করে ২০০৭-০৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকায় বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি ই-সার্ভিস বা ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সেবা সহজলভ্য করা এবং সেবাদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে ইউনিয়ন ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার (ইউআইএসসি) প্রতিষ্ঠা করে; যা ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে নামকরণ করা হয়।

---

*২০১৭ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ইউডিসির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন তথ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়, মূল্য ও সেবাপ্রাপ্তির জন্য গমনের (ভিজিট) হার তুলনামূলকভাবে হ্রাস করা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ধারণার আলোকে ইউডিসিকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থানীয় মানবসম্পদকে দক্ষ ও স্বনির্ভর জনবল হিসেবে গড়ে তোলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগী ভূমিকা রাখা এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে নগর ও প্রান্তিক পর্যায়ের মধ্যে প্রযুক্তিগত বৈষম্য হ্রাস করা।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে ৪ হাজার ৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদে ইতিমধ্যে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' হিসেবে ইউডিসি সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়কালে ইউডিসির অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। ইউডিসি থেকে ২০১৩-১৫ সালে ৪৫ মিলিয়ন জনগণকে সরাসরি সেবা প্রদান করা হয়েছে। তারপরও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে এবং সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ইউডিসির উদ্যোগের সফলতা, সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে গবেষণার চাহিদা অনুভূত হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারের সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণায় সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করছে এবং এর প্রসারের জন্য বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এটুআই প্রকল্পের পক্ষ থেকেও এ ধরনের গবেষণা সম্পাদনের জন্য টিআইবির কাছে ২০১৫ সালে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে টিআইবি এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রদানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি, বাণিজ্যিক ও তথ্যসেবা সহজলভ্য করতে ইউডিসির ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
- সেবা কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ইউডিসির উদ্যোগের সফলতা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা;
- ইউডিসির কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বা প্রভাব চিহ্নিত করা;
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

এ গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে খানাপর্যায়ে (৩ হাজার ৫৩টি খানা), ইউনিয়ন পরিষদে সচিব (৯১ জন) ও ইউডিসির উদ্যোক্তাদের (১০৪ জন) মধ্যে

পৃথক পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। খানাপর্যায়ের জরিপে বহু পর্যায়বিশিষ্ট গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতিতে খানা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৩১৫০টি খানার মধ্যে ৯৭টি খানা তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক ও অনুপস্থিত ছিল। ফলে চূড়ান্তভাবে জরিপকৃত মোট খানা ৩ হাজার ৫৩টি। ইউপি সচিব ও ইউডিসির উদ্যোক্তাদের মধ্যে জরিপ পরিচালনাকালে ১০৫টি ইউপিতে ১৪ জন সচিব এবং একজন উদ্যোক্তা অনুপস্থিত থাকায় তাদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। খানা জরিপে ডিজিটাল সেবার বিস্তৃতি, সহজলভ্যতা, সময়, খরচ ও সেবার জন্য গমন এবং ডিজিটাল সেবায় দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের প্রশ্ন করা হয়। অন্যদিকে ইউপি সচিব ও ইউডিসির উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে ইডিসির অবকাঠামো, সক্ষমতা ও পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। খানা জরিপে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে সেবাগ্রহীতারা যে সেবা নিয়েছেন, সে বিষয়ে তাদের তথ্য নেওয়া হয়েছে।

গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান (৩৩ জন), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (২০ জন), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেনারেল) (৮ জন), সহকারী কমিশনার (আইসিটি) (৫ জন), সহকারী পরিচালক (স্থানীয় সরকার) (৩ জন), প্রোগ্রামারের (৫ জন) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং এটুআই প্রকল্পের কর্মকর্তাদের (৬ জন) সঙ্গে একটি দলীয় আলোচনা করা হয়। ইউপি সচিব ও ইউডিসির উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে ইডিসির অবকাঠামো, সক্ষমতা ও পরিচালনার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল এটুআই প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন, নথি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

২০১৬ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের আগস্টের মধ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মাঠপর্যায়ে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষণা দল পরিবীক্ষণসহ জাতীয় পর্যায়ে এটুআই প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফলের ওপর তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

বিশ্লেষণকাঠামো

ইউডিসি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে কিছু নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণায়প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউডিসির সেবার ব্যাপ্তি; সেবাপ্রাপ্তিতে সময়, মূল্য ও সেবাপ্রাপ্তির জন্য গমন বা ভিজিট (টিসিভি); সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি; ইউডিসির অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও লজিস্টিকস; উদ্যোক্তার নির্বাচন-প্রক্রিয়া; উদ্যোক্তার দৈনিক উপস্থিতি; উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা; প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; তথ্য প্রকাশ ও প্রচার; ইউপির প্রশাসনিক কাজে সহায়তা; ইউডিসির আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ; তদারকি ব্যবস্থা; সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে অর্জন ও চ্যালেঞ্জ; অনিয়ম-দুর্নীতির অভিজ্ঞতার তুলনা; অংশীজনদের ভূমিকা পালনে চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি নির্দেশক বিবেচনা করা হয়েছে।

সেবা সহজলভ্য করতে ইউডিসির ভূমিকা

ইউডিসির কার্যপরিচলনা ও সেবা প্রদানের হার : জরিপকৃত ইউডিসিগুলো সপ্তাহে গড়ে ৬ দিন এবং প্রতিদিন গড়ে ৯ ঘণ্টা খোলা থাকে। ইউডিসিগুলোয় ৯৩ দশমিক ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা সময়সূচি অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের পেয়েছেন। ডিসেম্বর ২০১৬-এর তথ্য অনুযায়ী জরিপকৃত ইউডিসিগুলো দৈনিক গড়ে ২৬ জন (নারী : ৮ জন; পুরুষ : ১৮ জন) বা মাসে গড়ে ৭৮৫ জন (নারী : ২৩০ জন; পুরুষ : ৫৫৫ জন) সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করে।

ইউডিসিতে সেবার ব্যাপ্তি : জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ ২০১৬ সালে ইউডিসি থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে জন্মনিবন্ধন সেবা (৭১ দশমিক ৮ শতাংশ) নেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সবচেয়ে কম সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন তথ্যসেবা (শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ) গ্রহণ করেছেন। অন্য যেসব সেবা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেবাগ্রহীতা গ্রহণ করেছেন, সেগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের সনদ কম্পোজ ও প্রিন্ট (১১ দশমিক ৯ শতাংশ), ছবি তোলা ও প্রিন্ট (৭ দশমিক ২ শতাংশ), ফটোকপি ও লেমিনেটিং (৪ দশমিক ৮ শতাংশ)। অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ, প্রিন্ট (শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ) ও জমির পর্চার জন্য অনলাইনে আবেদনের (শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ) মতো ডিজিটাল সেবা খুবই অল্পসংখ্যক সেবাগ্রহীতা নিয়েছেন। উদ্যোক্তার সক্ষমতার ভিন্নতা ও স্থানীয়ভাবে সব সেবার চাহিদা এক রকম না হওয়ায় ইউডিসিগুলোয় সব ধরনের সেবা একইভাবে সহজলভ্য নয়। এলাকাভেদে সেবার চাহিদা ও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উদ্যোক্তার সক্ষমতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সেবা প্রবর্তন করা হয়।

সেবাপ্রাপ্তিতে সময়, মূল্য ও সেবাপ্রাপ্তির জন্য গমন বা ভিজিট (টিসিভি) : জরিপকৃত খানার সেবাগ্রহীতাদের অর্ধেক (৫১ দশমিক ৪ শতাংশ) সেবাগ্রহীতা ইউডিসিতে একবার গিয়েই সেবা পেয়েছেন। বাকি অর্ধেক সেবাগ্রহীতাকে সেবা পাওয়ার জন্য একাধিকবার যেতে হয়েছে। একাধিকবার যাওয়ার কারণ হলো–সেবার ধরন (৩১ দশমিক ৩ শতাংশ); সেবাগ্রহীতাদের ভিড় (২২ দশমিক ৬ শতাংশ); প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি (১৯ দশমিক ৮ শতাংশ); ইউপি সচিবের অনুপস্থিতি (১২ দশমিক ৯ শতাংশ); বিদ্যুৎ না থাকা (৯ দশমিক শূন্য শতাংশ); ইন্টারনেট-সংযোগ না থাকা (৭ দশমিক ৫ শতাংশ); প্রয়োজনীয় কাগজ না থাকা (৪ দশমিক ৬ শতাংশ); কম্পিউটার, প্রিন্টার ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকা (১ দশমিক ৯ শতাংশ)।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জন্মনিবন্ধন সেবা নেওয়ার হার সর্বাধিক হওয়ায় এই সেবাকে কেস হিসেবে বিবেচনা করে দেখা যায়, ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতা ইউডিসিতে একবার গিয়েই এই সেবা পেয়েছেন। যারা একাধিকবার গেছেন, তাদের একাধিকবার যাওয়ার

উল্লেখযোগ্য কারণ হলো—সেবার ধরন (৩১ দশমিক ২ শতাংশ); সেবাগ্রহীতাদের ভিড় (২৩ দশমিক ৩ শতাংশ); প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি (২১ দশমিক ৩ শতাংশ); ইউপি সচিবের অনুপস্থিতি (১৪ শতাংশ); বিদ্যুৎ না থাকা (৯ দশমিক শূন্য শতাংশ); ইন্টারনেট-সংযোগ না থাকা (৮ দশমিক ৫ শতাংশ); প্রয়োজনীয় কাগজ না থাকা (৫ দশমিক শূন্য শতাংশ); কম্পিউটার, প্রিন্টার ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকা (১ দশমিক ৮ শতাংশ)।

জমির পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন এবং পাসপোর্টের জন্য আবেদন ফরম পূরণের ডিজিটাল সেবাকে এ গবেষণায় কেস হিসেবে বিবেচনা করে, প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রদানকৃত সেবার তুলনায় সময়, অর্থ ব্যয় ও গমন সংখ্যা এবং দুর্নীতির সংঘটনের তুলনামূলক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জমির পর্চা উত্তোলনের আবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জেলা পর্যায়ের ভূমি রেকর্ড রুম থেকে সেবা নিতে ৮৯ জন সেবাগ্রহীতার মধ্যে ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশকে ৪-৫ ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়েছে; থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত বাবদ গড়ে ৪৪৯ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে এবং তিনবার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে যেতে হয়েছে। এ ছাড়া ৫৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে এ সেবার জন্য গড়ে ৭৩৭ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে, ইউডিসি থেকে জমির পর্চা উত্তোলনের আবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৫ জন সেবাগ্রহীতার মধ্যে ২ জনকে ১-২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়েছে; থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত বাবদ কোনো টাকা ব্যয় করতে হয়নি (শুধু সেবামূল্য হিসেবে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ১০০ টাকা দিতে হয়েছে) এবং দুবার ইউডিসিতে যেতে হয়েছে। উপরন্তু, জরিপভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের কেউ আর্থিক অনিয়ম বা ঘুষের শিকার হননি। অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়।

ইউডিসির কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও লজিস্টিকস : ২০০৯-১১ সালে ৪ হাজার ৫০১টি ইউডিসি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠাকালীন মোট বরাদ্দ ছিল ২৭৭ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা (৪০ মিলিয়ন ইউএসডি)। এই বরাদ্দের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে এসেছে ২৪৩ দশমিক ০৪ কোটি টাকা (৩৫ মিলিয়ন ইউএসডি) এবং ইউএনডিপির অর্থায়নে এটুআই প্রকল্প থেকে এসেছে ৩৪ দশমিক ৭২ কোটি টাকা (৫ মিলিয়ন ইউএসডি)। ইউডিসির যন্ত্রপাতি, আসবাব ও বিভিন্ন স্টেশনারিজ, এক্সেসরিজ ক্রয় বাবদ প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা। যন্ত্রপাতির জন্য এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওরিয়েন্টেশন এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার জন্য ১২২ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

জরিপকৃত ইউডিসিগুলোয় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ক্যামেরা, ফটোকপি মেশিনের মতো একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ৩২-৪২ শতাংশ অচল রয়েছে। এই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যন্ত্রপাতি অচল থাকায় সেবা প্রদানে মন্থর গতি লক্ষণীয়। প্রান্তিক অঞ্চলে যন্ত্রপাতি মেরামত ও

রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ জনবলের ঘাটতি থাকায় প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় না। দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠাকালীন যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি থাকায় ইউপি কর্তৃপক্ষ এবং উদ্যোক্তার মধ্যে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় বা নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততার ঘাটতি দেখা যায়।

উদ্যোক্তার নির্বাচন-প্রক্রিয়া : পরিপত্রে ইউডিসি ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উদ্যোক্তা নির্বাচনের উল্লেখ থাকলেও এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা নেই। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ৩২ শতাংশ (২৯টি) ইউডিসিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বপ্রণোদিত হয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু ৬৮ শতাংশ (৬২টি) ইউডিসিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। ৮৭ শতাংশ (৭৯টি) ইউডিসিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতাবলে এবং ১৩ শতাংশ (১২টি) ইউডিসিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, পরিপত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে যোগ্য নারী উদ্যোক্তা না পাওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ উদ্যোক্তার পরিবারের কোনো নারী সদস্যকে (স্ত্রী বা বোন) উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

নারী-পুরুষ উভয় পদে উদ্যোক্তার উপস্থিতি : জরিপকৃত ইউডিসির মধ্যে ৭৬ শতাংশ ইউডিসিতে নারী-পুরুষ উভয় উদ্যোক্তা আছেন, ২৩ শতাংশ ইউডিসিতে শুধু পুরুষ ও ১ শতাংশ ইউডিসিতে শুধু নারী উদ্যোক্তা আছেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে যোগ্য নারী উদ্যোক্তা না পাওয়ায় ও উদ্যোক্তার বিয়ে হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় অনেক ইউডিসিতে নারী উদ্যোক্তার পদ শূন্য রয়েছে।

উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা : সর্বাধিক উদ্যোক্তা (৮৯ শতাংশ) কম্পিউটার বেসিকস প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়বর্ধক বিষয়ের ওপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যেমন ফ্রিল্যান্সিং (৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ) ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট (১৫ দশমিক ৯ শতাংশ)। তবে নারী উদ্যোক্তার তুলনায় পুরুষ উদ্যোক্তারা বেশি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থী না থাকায় স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন পরিচিত লোক দ্বারা ইউডিসি পরিচালনা করা হয়। ফলে সেবা দেওয়ার গুণগত মানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা হ্রাস পায়।

উদ্যোক্তার চুক্তির মেয়াদ : পরিপত্রে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সময় উল্লেখ করা নেই। জরিপকৃত ইউডিসির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ৩-৫ বছরমেয়াদি চুক্তি করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউপির নেতৃত্বে পরিবর্তন, সচিবের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা সম্পর্কের ঘাটতির কারণে উদ্যোক্তার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই ঝুঁকির কারণে এবং স্বল্পমেয়াদি চুক্তি হওয়ায় উদ্যোক্তারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

উদ্যোক্তার দৈনিক উপস্থিতি : পরিপত্রে উদ্যোক্তার দৈনিক উপস্থিতি বা এর সময়সূচি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা নেই। জরিপকৃত এলাকার ইউডিসিগুলোয় পুরুষ উদ্যোক্তা মাসে গড়ে ২৪ দিন এবং নারী উদ্যোক্তা মাসে গড়ে ১৫ দিন উপস্থিত থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প আয় ও বন্টনের ঝুঁকি থাকায় পুরুষ উদ্যোক্তা কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন অপরিচিত পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করাকে অনুৎসাহিত করা, উপার্জনের জন্য কোথাও চাকরি করাকে গ্রামাঞ্চলের সামাজিকতায় স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করা ইত্যাদি নারী উদ্যোক্তাদের অনিয়মিত উপস্থিতির অন্যতম কারণ।

ইউডিসির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা : ইন্টারনেট-সংযোগের জন্য ৯৮ শতাংশ ইউডিসিতে সিম মোডেম ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ইউডিসিতে সরকারি অপটিক ফাইবার (১৩ শতাংশ) ও বেসরকারি ব্রডব্যান্ডের (৫ শতাংশ) মাধ্যমেও ইন্টারনেট-সংযোগ নিতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, ১৯ শতাংশ ইউপিতে ফাইবার অপটিক লাইন টানা হলেও ৬ শতাংশ ইউপিতে ইন্টারনেট-সংযোগ চালু করা হয়নি। সিম মোডেম ব্যবহারের আধিক্য থাকায় ইন্টারনেটের ধীরগতি দেখা যায়, ফলে অধিকাংশ ইউডিসিতে অনলাইন সেবা প্রদান বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে, জরিপকৃত ইউডিসির মধ্যে ৩৮ শতাংশ ইউডিসিতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প উৎস (সৌর প্যানেল, আইপিএস, জেনারেটর) রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে সেবা প্রদান ব্যাহত হয়।

ইউডিসির প্রচার ও তথ্য প্রকাশ : জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার অধিকাংশ খানা (৫৫ দশমিক শূন্য শতাংশ) পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও ইউনিয়ন পরিষদে কোনো কাজে গিয়ে (৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ) ইউডিসির সেবা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। উল্লেখ্য, মাইকিং (৬ দশমিক ৬ শতাংশ) ও রেডিও-টিভি, সংবাদপত্র, জাতীয় তথ্য বাতায়নের (৪ দশমিক ২ শতাংশ) মাধ্যমে নিজে সরাসরি অবহিত হওয়ার হার খুবই কম পাওয়া গেছে, যা প্রান্তিক পর্যায়ে সীমিত প্রচারণা ও প্রযুক্তির ঘাটতির বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। স্থানীয় পর্যায়ে ইউডিসির সেবার ব্যাপ্তি সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতির কারণে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৭৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ইউডিসির নাম জানলেও সেবার ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানে না। জরিপের তথ্যানুযায়ী ৪৫ শতাংশ ইউডিসিতে সেবার নাম ও মূল্যসংবলিত পূর্ণাঙ্গ তথ্যবোর্ড পাওয়া গেছে। কোনো কোনো স্থানে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যানার ও তথ্যবোর্ড নষ্ট হলেও তা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়।

ইউপির প্রশাসনিক কাজে সহায়তা : পরিপত্রে উল্লেখ রয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ ইউডিসিকে সেবার বিপরীতে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে সম্পৃক্ত করবে। প্রশাসনিক কাজের ধরনের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা প্রস্তুত ও প্রিন্ট; বিভিন্ন নোটিশ, চিঠি কম্পোজ ও প্রিন্ট; বিভিন্ন মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত ও হিসাব-সম্পর্কিত তথ্য কম্পোজ ও প্রিন্ট; গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কম্পোজ; বিভিন্ন উপকারভোগীর ছবি প্রিন্ট (সামাজিক নিরাপত্তা

কর্মসূচির আওতাভুক্ত করতে ছবি প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে অপারগ উপকারভোগীর ছবি ইউপি ইউডিসি থেকে প্রিন্ট করে); ই-মেইল; ফটোকপি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ইউপি প্রশাসনিক কাজ করালেও ইউডিসিকে সেই সেবার বিপরীতে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে না।

ইউডিসির আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ : জরিপকৃত ইউডিসির মাসিক গড় আয় ২২ হাজার ২২১ টাকা, গড় বিনিয়োগ ও ব্যয় ৬ হাজার ৪১৮ টাকা এবং মুনাফা ১৫ হাজার ৮০৩ টাকা পাওয়া গেছে। প্রায় ৪২ শতাংশ ইউডিসি সার্বিক গড় মুনাফার (১৫ হাজার ৮০৩ টাকা) থেকে বেশি মুনাফা করে, যেখানে বাণিজ্যিক সেবা প্রদানের হারও বেশি (৭৫ শতাংশের অধিক ক্ষেত্রে)। কোনো কোনো (১৪ দশমিক ৯ শতাংশ) ইউডিসিতে আয় তুলনামূলক অনেক কম (গড়ে মাসিক ৫ হাজার টাকার কম)। উপরন্তু মুনাফা কীভাবে বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় পুরুষ উদ্যোক্তা নারী উদ্যোক্তাকে কাজে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহিত করেন না। ৫০ শতাংশ ইউডিসির প্রত্যাশিত মাত্রায় আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় লোকাল গভর্নেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (৩৪টি) ও ইউনিয়ন পরিষদ (২৫টি) থেকে সংশ্লিষ্ট ইউপির তহবিলের পর্যাপ্ততার সাপেক্ষে বিগত এক বছরে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার অর্থমূল্য ইউডিসি প্রতি মাসিক গড়ে ৪ হাজার ৩৫৩ টাকা। ইউপি থেকে এই সহায়তা ইউডিসির আত্মনির্ভরশীলতা ও টেকসইকরণের অন্তরায়।

তদারকির ব্যবস্থা

দৈনিক প্রতিবেদন : এটুআই নির্ধারিত ডেটাবেইসে ৬৭ শতাংশ উদ্যোক্তা নিয়মিত (প্রতিদিন) দৈনিক প্রতিবেদন এন্ট্রি দেন। অন্যদিকে, প্রতিদিন এন্ট্রি দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ২৫ দশমিক ২ শতাংশ উদ্যোক্তা নিয়মিত দেন না। কোনো কোনো উদ্যোক্তা (৭ দশমিক ৮ শতাংশ) দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেদন এন্ট্রি দেন না।

মাসিক প্রতিবেদন : উদ্যোক্তার প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়টি পরিপত্রে উল্লেখ রয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি তা পর্যালোচনা করে ইউডিসির প্রচারণা ও টেকসইকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ৫৫ দশমিক ৩ শতাংশ উদ্যোক্তা ইউডিসির ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে মাসিক প্রতিবেদন জমা দেন। কোনো কোনো ইউপি চেয়ারম্যানের ধারণা কম থাকায় তদারকির ক্ষেত্রে অনাগ্রহ, ইউডিসির প্রচারণা ও টেকসইকরণে কার্যকর ভূমিকা পালনে দায়িত্ববোধের ঘাটতি লক্ষণীয়।

ইউএনও কার্যালয় কর্তৃক তদারকি : মাসিক সমন্বয় সভায় ইউডিসির অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনলাইনে সরাসরি ইউডিসির প্রতিদিনের কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইউএনও কখনো কখনো সরাসরি ইউডিসি ভিজিট করেন। এ ছাড়া ইউএনও ইউপি সচিব বা উদ্যোক্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন, ইউএনও কার্যালয়ে সরাসরি উদ্যোক্তার সঙ্গে

সাক্ষাতের মাধ্যমে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ইউডিসির অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত হন। কোনো কোনো উপজেলায় পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে সরাসরি ইউডিসিতে গিয়ে এর কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে।

তথ্য সংরক্ষণ : পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় সব উদ্যোক্তা তথ্য সংরক্ষণ করেন না। তবে ৩৫ শতাংশ উদ্যোক্তা প্রদানকৃত সেবা ও সেবাগ্রহীতা সম্পর্কিত তথ্য (সেবাগ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর; সেবার ধরন ও মূল্য ইত্যাদি) নিয়মিত রেজিস্টারভুক্ত করেন।

সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি

জরিপকৃত ইউডিসির সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, উদ্যোক্তাদের আচরণে সবচেয়ে বেশি সেবাগ্রহীতা (৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সেবাগ্রহীতা (২৭ দশমিক ১ শতাংশ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (চিত্র : ১)

চিত্র ১ : জরিপকৃত ইউডিসির সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি (সেবাগ্রহীতার শতকরা হার)

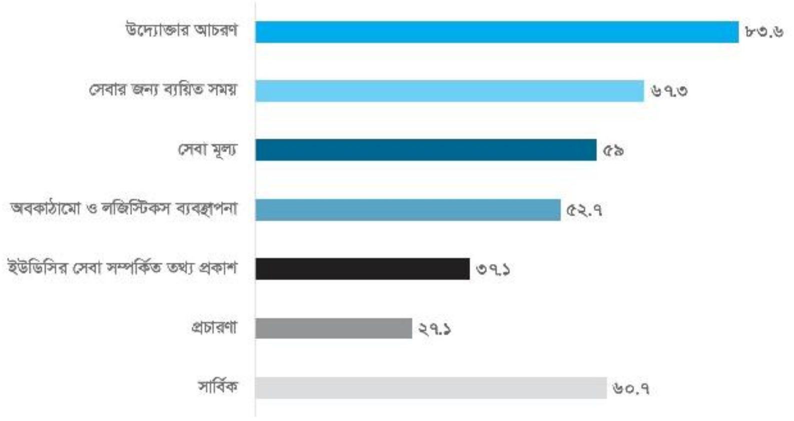

নাগরিক সেবায় ইউডিসির অর্জন

তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে সরকারি, বাণিজ্যিক ও তথ্যসেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত ও সহজলভ্য করতে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। ইউডিসি থেকে গ্রামাঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খানা ২০১৬ সালে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছে এবং সেবাগ্রহীতাদের ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ সার্বিকভাবে ইউডিসির সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্র ও জেলা পর্যায় থেকে প্রদানকৃত সরকারি সেবা (জমির পর্চা উত্তোলনের আবেদন, প্রবাসী শ্রমিক নিবন্ধন, হজ নিবন্ধন ইত্যাদি) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রদান শুরু করায় সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়, সেবার জন্য গমন সংখ্যা ও সময় হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি

হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ইউডিসি থেকে ডিজিটাল সেবা প্রবর্তনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে (জমির পর্চা উত্তোলনের আবেদন, পাসপোর্টের আবেদন ফরম পূরণ) সেবাগ্রহীতা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ হ্রাস পাওয়ায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যন্ত্রপাতি অচল, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা ও ইন্টারনেটের ধীরগতি সত্ত্বেও ইউডিসিগুলো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। ৫০ শতাংশ ইউপির মাসিক গড় মুনাফা (১৪ হাজার ৪৫৯ টাকা) সার্বিক গড় মুনাফার (১৫ হাজার ৮০৩ টাকা) প্রায় সমান, যা ইউডিসির আর্থিক সচ্ছলতার নির্দেশক। এ ইউডিসিগুলো ইউপি থেকে কোনো সহায়তা গ্রহণ করছে না। প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ইউডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইউনিয়ন পরিষদের সেবা ডিজিটাল তথ্যভান্ডারে নথিভুক্ত হওয়ায় ইউপির প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে।

নাগরিক সেবায় ইউডিসির সম্ভাবনা

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা ও সেবার বিস্তৃতির মাধ্যমে আয় ও মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ আছে, যা ইউডিসি টেকসইকরণে সহায়ক হবে। সব প্রতিষ্ঠানের সেবা পরিপূর্ণ ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা সমন্বিতভাবে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণের সুযোগ রয়েছে, যা সেবাগ্রহীতাদের সেবার জন্য অর্থ ব্যয়, সময় ও গমন সংখ্যা হ্রাসে অধিকতর সহায়ক হবে। সরকারি সেবার ব্যাপ্তি প্রসার ও বহুমুখী করার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সংযোগ কমবে এবং সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জনগণের কাছে স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইউডিসির মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। ইউডিসির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যাশিত মাত্রায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের এই মডেলের কার্যকারিতা প্রতিফলনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

অংশীজনদের ভূমিকা পালনে চ্যালেঞ্জ

ব্যবস্থাপনা কমিটি : পরিপত্রে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনপদ্ধতি, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতাবিষয়ক নির্দেশনা ও চুক্তির মেয়াদ, উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের নির্দেশনা, সেবামূল্য (সার্ভিস চার্জ) এবং ইউপি থেকে সহায়তা পাওয়ার শর্তাবলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। এ ছাড়া, সম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নতুন চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হওয়ায় তাদের ইউডিসির কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি দেখা গেছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউডিসির কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ইউএনওর কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন : উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জেলা ও উপজেলায় 'অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রামার' পদের অপর্যাপ্ততার কারণে ইউডিসিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। কোনো কোনো উপজেলায় ইউডিসির সক্ষমতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ইউএনও অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকৃত আয়ের তুলনায় বেশি পরিমাণ আয় অনলাইনে দৈনিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। ফলে ইউডিসির প্রকৃত আয়ের তথ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না।

এটুআই প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ : সেবা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজেশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের সেবা সমন্বিতভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততার কারণে সেবা প্রদানে মন্থর গতি বিদ্যমান।

ইউডিসি টেকসইকরণের সার্বিক চ্যালেঞ্জ

ইউডিসির বিদ্যমান বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে এর টেকসইকরণের পথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউডিসি পরিচালনা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে, যেমন উদ্যোক্তা নির্বাচন-প্রক্রিয়া, উদ্যোক্তার প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয় দক্ষতার নির্দেশনা, চুক্তির মেয়াদ, উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের নির্দেশনা, ইউপি থেকে সহায়তা পাওয়ার নির্দিষ্ট শর্তাবলি, তথ্য সংরক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে অংশীজনদের জন্য নির্দেশনা, সেবামূল্য (সার্ভিস চার্জ) সম্পর্কে নির্দেশনা নীতিমালায় এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। ইউডিসির কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া ইন্টারনেট ও সার্ভারের ধীরগতিসহ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততাও রয়েছে। সেবা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশন না হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সেবা সমন্বিতভাবে প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়নি। অচল যন্ত্রপাতি মেরামত বা নতুনভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার নির্দেশনার ঘাটতি এবং ইউডিসির সেবার ধরন ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণার অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের একাংশের মধ্যে ইউডিসির বিকাশ ও টেকসইকরণে অনুঘটকের ভূমিকা পালনে দায়িত্ববোধের ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উদ্যোক্তার মধ্যে 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব' সম্পর্কে ধারণার ঘাটতির পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে তাদের আত্তীকরণের প্রত্যাশার প্রতিফলন হতে দেখা যায়।

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে ইউডিসির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে টিআইবি নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

নীতিমালা সম্পর্কিত

১. ইউডিসি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিচের বিষয় উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে–

- উদ্যোক্তাদের নির্বাচনপদ্ধতি
- উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতাবিষয়ক নির্দেশনা
- উদ্যোক্তার চুক্তির মেয়াদ
- উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের নির্দেশনা
- ইউপি থেকে সহায়তা পাওয়ার নির্দিষ্ট শর্তাবলি
- ইউডিসির কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য নির্দেশনা
- সেবামূল্য (সার্ভিস চার্জ) সম্পর্কে নির্দেশনা।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি-সম্পর্কিত

২. প্রকল্প হিসেবে ইউডিসির টেকসইকরণের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. এটুআইয়ের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবার অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমানের সেবার ব্যাপ্তি ও প্রসার সব ইউডিসিতে একই রকম হতে হবে।

৪. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎস হিসেবে ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের (আইপিএস) ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ইন্টারনেটের দ্রুতগতির জন্য সব ইউপিতে অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে ইন্টারনেট-সংযোগ দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

৬. অচল যন্ত্রপাতি মেরামত ও নতুনভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে এবং নষ্ট ব্যানার ও তথ্যবোর্ডের পরিবর্তে নতুন ব্যানার ও তথ্যবোর্ড সংযুক্ত করার মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সরকারি সেবার বিপরীতে সরকারি ফি ও সেবামূল্য (সার্ভিস চার্জ) পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক রসিদ প্রদান করতে হবে।

৮. সেবা সহজীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সব প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ ও সমন্বিত ডিজিটাইজড সেবা প্রবর্তন করতে হবে, এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯. উদ্যোক্তাদের তথ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১০. উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আরও উৎসাহিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ধারণা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশীজনদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি-সম্পর্কিত

১১. স্থানীয়ভাবে মাইকিং, লিফলেট প্রকাশ, উঠান বৈঠক, স্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিজ্ঞাপন এবং জাতীয়ভাবে বিটিভিতে টিভিসির মাধ্যমে ইউডিসির সেবার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে; বিশেষ করে ইউডিসি থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় সাশ্রয়ের দিকটি প্রচার করতে হবে।

১২. নির্বাচিত নতুন জনপ্রতিনিধিদের ইউডিসি এবং ই-সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (ওরিয়েন্টেশন) দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

সুভাষ ভাটনগর, 'ই-গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ : কারেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড ইমপ্রুভিং সার্ভিস ডেলিভারি ফর ই-ইনক্লুশন', ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদ, ২০১৪।

মো. গোলাম ফারুকি, 'রিচিং দ্য আনরিচড? : অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অব ইউনিয়ন ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টারস (ইউআইএসসি) ইন বাংলাদেশ ফ্রম বেনিফিশিয়ারি পারসপেকটিভ', প্রসিডিংস অব দ্য অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস কনফারেন্স ২০১৪ (ইন পার্টনারশিপ উইথ *দ্য জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস*)।

মো. গোলাম ফারুকি, 'অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অব ই-গভর্নমেন্ট : কেস স্টাডি অন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারস (ইউডিসি) ইন বাংলাদেশ', *অস্ট্রেলিয়ান জার্নাল অব সাসটেইনেবল বিজনেস অ্যান্ড সোসাইটি*, অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ভলিউম ১, নং ১, মার্চ ২০১৫।

মো. মাসুম আলম, *এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড এফেক্টিভনেস অব ইউআইএসসি*, লোকপ্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ২০১৪।

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল
পাসপোর্ট সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. আলী হোসেন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান বরিশাল জেলার আওতাভুক্ত সিটি করপোরেশন, ৬টি পৌরসভা ও ১০টি উপজেলার জনগণের পাসপোর্ট সেবা প্রদানে নিয়োজিত। ১৯৮১ সালে এটি অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সময়ে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুরসহ মোট ৬টি জেলার জনগণের সেবা দিত।

বর্তমানে সব জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই অফিসের সেবাদানের আওতা বরিশাল জেলায় বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে সীমিত। ২০১০ সালে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন জেলাগুলোর পাসপোর্ট অফিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির লক্ষ্যে এটিকে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং ২০১৪ সালে বরিশাল শহরের নতুল্লাবাদ এলাকায় নতুন ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। বরিশাল পাসপোর্ট অফিস থেকে নভেম্বর ২০১৫ থেকে অক্টোবর ২০১৬ সময়ে ৩০ হাজার ১৪টি পাসপোর্ট প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সাধারণ আবেদনের ভিত্তিতে পাসপোর্ট ইস্যু হয় ২৫ হাজার ৯০৩টি এবং জরুরি আবেদনের ভিত্তিতে ৪ হাজার ১১১টি। কর্মদিবস হিসাবে বরিশাল পাসপোর্ট অফিস থেকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১২৪টি পাসপোর্ট ইস্যু হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালে বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সেবায় অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য–যেমন পাসপোর্ট অফিসের বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে কর্মকর্তা, কর্মচারী, দায়িত্বরত আনসার ও পুলিশের একাংশসহ একশ্রেণির দালাল জড়িত বলে একাধিক স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া পাসপোর্ট সেবায় সরকার-নির্ধারিত ফির বাইরে সেবাগ্রহীতাদের অতিরিক্ত ব্যয় বহনে বাধ্য হওয়া এবং পাসপোর্ট অফিস থেকে গ্রাম থেকে আসা ও কম শিক্ষিত সেবাগ্রহীতাদের পাসপোর্ট করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান না

---

*২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর বরিশালের বিডিএস হলে আয়োজিত সাংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

করার অভিযোগ রয়েছে। টিআইবি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে 'সচেতন নাগরিক কমিটি'র (সনাক) মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সনাক স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা ও সেবার গুরুত্ব বিবেচনায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), বরিশাল কর্তৃক এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই গবেষণা বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সেবায় বিদ্যমান সমস্যা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশালের পাসপোর্টের সেবায় সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- পাসপোর্টের সেবা প্রদানে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশালের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- পাসপোর্টের সেবায় বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশালের বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি চিহ্নিত করা।

এই গবেষণায় বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সেবার বিভিন্ন ধাপে (আবেদনপত্র উত্তোলন, আবেদনপত্র জমাদান, প্রি-এনরোলমেন্ট, বায়ো-এনরোলমেন্ট ও পাসপোর্ট বিতরণ) চ্যালেঞ্জ এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা; প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, জনবল, ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় আসবাব ও যন্ত্রপাতি; বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সঙ্গে দালালের সম্পৃক্ততা এবং সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি; পাসপোর্ট অফিসের সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও এসবি পুলিশের ভূমিকা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্তকরণে বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশালের ভিসা ও পাসপোর্টের সেবার মধ্যে শুধু পাসপোর্টের সেবাকে গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎস থেকে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলো হলো সেবাগ্রহীতা জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনা। একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাদের ওপর পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বরিশাল পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক

তথ্য, গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সেবাগ্রহীতা জরিপটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু পর্যায়ী নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৩৫০ জন সেবাগ্রহীতার ওপর 'একজিট পোল' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার মধ্যে যারা পাসপোর্ট করার সব প্রক্রিয়া শেষ করে পাসপোর্ট হাতে পেয়েছেন, তাদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পাসপোর্ট অফিসের ২১টি কর্মদিবসের মধ্যে ১০টি কর্মদিবস দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে পাসপোর্ট অফিসের সেবা চলাকালে (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এই গবেষণা কার্যক্রমটি নভেম্বর ২০১৬ থেকে আগস্ট ২০১৭ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে সেবাগ্রহীতা জরিপটি ৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে পরিচালিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্যের সময়কাল নভেম্বর ২০১৫ থেকে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত। জরিপ পরিচালনার সময় তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও গুণগত মান বজায় রাখতে ১৪ শতাংশ স্পট চেক, অ্যাকোম্পানি চেক ১২ শতাংশ ও ১০ শতাংশ টেলিফোন চেক করা হয়। এর পাশাপাশি প্রতিদিনের জরিপ শেষে সনাক কার্যালয়ে শতভাগ প্রশ্নপত্র সম্পাদনা এবং কোডিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

জনবলের ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির কারণে কাজের চাপ লক্ষণীয়। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই অফিসের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২১টি হলেও বর্তমানে ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এই অফিসে উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে দুটি কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ রয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কর্মকর্তা পর্যায়ে দুটি পদের বিপরীতে বর্তমানে একজন কর্মরত থাকায় দায়িত্বরত কর্মকর্তার ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ লক্ষণীয়। দুজন কর্মকর্তা পদের বিপরীতে একজন কর্মরত থাকায় কোনো কারণে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছুটিতে বা অনুপস্থিত থাকলে ক্ষেত্রবিশেষ পাসপোর্টের প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অপরদিকে আবেদনপত্র জমাদান কাউন্টার, প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্টে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় কাজের চাপ লক্ষণীয়। বর্তমানে জমাদান কাউন্টারে একজন ব্যক্তিকে গড়ে প্রতিদিন ১২৪টি আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইসহ গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্ট কাউন্টার বা কক্ষে দুজন ব্যক্তিকে গড়ে প্রতিদিন ৬২টি এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে আবেদনপত্র জমাদানের আলাদা কাউন্টার নেই। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, নারী ও পুরুষ আলাদা লাইনে দাঁড়ালেও একটি কাউন্টারের মাধ্যমে দুজন পুরুষ ও একজন নারী এই ভিত্তিতে

আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। নারী, পুরুষ, অসুস্থ, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবাইকে একটি কক্ষে দুটি কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রি-এনরোলমেন্ট করা হয়। কক্ষের দরজা ছোট হওয়া, জায়গার স্বল্পতা ও দীর্ঘ সময় নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নারী সেবাগ্রহীতারা বিরক্ত বোধ করেন। একই অবস্থা বায়ো-এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রেও বিরাজমান। একটি কক্ষে দুজন টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে বায়ো-এনরোলমেন্ট করা হয়। বায়ো-এনরোলমেন্ট কক্ষে পর্যাপ্ত আলোর অভাব লক্ষ করা গেছে। বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে একাধিক টয়লেট থাকলেও সেবাগ্রহীতারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব সেবাগ্রহীতাকে পাসপোর্ট বিতরণ কাউন্টারের সামনের একটি টয়লেট ব্যবহার করতে দেখা গেছে। সেবাগ্রহীতাদের জন্য বসার ব্যবস্থা থাকলেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আলাদা বসার ব্যবস্থা নেই।

সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার : বরিশাল পাসপোর্ট অফিস ভবনের ভেতরে প্রবেশের জন্য দুটি ফটক (গেট) থাকলেও এই অফিসে সাধারণ পাসপোর্ট প্রার্থীদের প্রবেশাধিকার অনেকাংশে সংরক্ষিত। দুটি ফটকের একটি মূল ফটক, অন্যটি পার্শ্বফটক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূল ফটকটি বন্ধ থাকার কারণে সেবাগ্রহীতাদের পাসপোর্ট অফিসের ভেতরে যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা পার্শ্বফটক ব্যবহার করে পাসপোর্ট অফিসের ভেতর প্রবেশ করতে চাইলে আনসার কর্তৃক বাধা এবং বিভিন্ন অযাচিত প্রশ্নের (যেমন কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, কেন যাবেন, কী কারণে যাবেন ইত্যাদি) সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অভিযোগ বা কোনো বিষয়ে জানার থাকলে সেটা জানানো বা জানা থেকে বঞ্চিত হন। আবার কোনো কর্মচারী দুর্ব্যবহার বা অনৈতিক আচরণ করলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্টের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা বিদ্যমান। যেমন মাঝে মাঝে লোকাল নেটওয়ার্ক ও সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, নেটওয়ার্ক না পাওয়া, রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে লিংক ডাউন থাকার কারণে ছবি পেতে বিলম্ব বা নতুন ছবি সার্ভারে না নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া কোনো ধরনের কারিগরি ত্রুটি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে টেকনিশিয়ান এনে সমাধান করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। ফলে এই সময় সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়।

সেবা প্রদানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সদিচ্ছার ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সেবা প্রদানে সদিচ্ছার ঘাটতি লক্ষণীয়। এই অফিসে পাসপোর্টের আবেদনপত্র জমা দিতে গেলে জমাদান কাউন্টার থেকে কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে হয়রানি করা এবং আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। জমাদান কাউন্টার থেকে সেবাগ্রহীতাদের

একাংশকে আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি বলে ফেরত দেওয়া হয়। এ ছাড়া আবেদনপত্র জমাদানে আবেদনপত্রের কোথায় ভুল হয়েছে, কী ভুল হয়েছে এবং করণীয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারণা প্রদান না করে দিনের শেষভাগে আবেদনপত্র ফেরত দেওয়া হয়, যখন ভুলত্রুটি ঠিক করে আবেদনকারীদের পক্ষে জমা দেওয়ার সময় থাকে না। পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের একাংশ এভাবে সেবাগ্রহীতাদের অযাচিত ঝামেলায় ফেলে দালালের কাছে যেতে বাধ্য করে থাকেন। উল্লেখ্য, বরিশাল সদরের সঙ্গে বেশ কিছু উপজেলার (হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ ও বানারীপাড়া) ও ইউনিয়নের যোগাযোগব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় সেবাগ্রহীতারা আরও একদিন সময় ব্যয় কওে কাজ সম্পন্ন করা এবং এ ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ ব্যয় বিবেচনা করে দালালের কাছে যান বা যেতে বাধ্য হয়ে থাকেন।

অপর্যাপ্ত সেবা : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের পাসপোর্টবিষয়ক সেবা পর্যাপ্ত নয়। কোনো আবেদনপত্র ভুল হলে করণীয় কী, কার কাছে গেলে এর সমাধান পাওয়া যাবে এবং কীভাবে সমাধান হবে–এসব ব্যাপারে অনেকাংশে উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবাগ্রহীতাদের দুটির পরিবর্তে একটি আবেদনপত্র সরবরাহ করা হয়। আবার একটি আবেদনপত্র পূরণ করে অন্যটি যে ফটোকপি করে জমা দেওয়া যায়, সে বিষয়েও সেবাগ্রহীতাদের ধারণা দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় তথ্যের অপর্যাপ্ততা ও বরিশাল পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের অভাবে গ্রাম থেকে আসা ও কম শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাসপোর্ট প্রক্রিয়ার শুরুতেই দালাল ধরতে বাধ্য হন। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রাম এলাকার সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ দালালের সহযোগিতা নিয়েছেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। এ সেবায় প্রশাসনিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযুক্তি, দক্ষতা, আইসিটি এবং ইলেকট্রনিক জ্ঞানের সমন্বয় রয়েছে। পাসপোর্টের সেবায় বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ডেটা এনরোলমেন্ট, প্রক্রিয়াকরণ এবং আদান-প্রদান করতে হয়। সেবা কার্যক্রমে প্রশাসনিক, কারিগরি বা অন্য কোনো সমস্যা হলে তা তাৎক্ষণিক সমাধান করতে হয়। কিন্তু বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তাদের (সহকারী পরিচালক) এ ধরনের কোনো বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ না থাকায় তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে পাসপোর্ট সেবার ওপর এক মাসের যে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়, সেটা চাহিদার সবটুকু পূরণ করে না।

তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সদিচ্ছার ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র নামে একটি কাউন্টার থাকলেও তার কার্যকর বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার ঘাটতি লক্ষণীয়। এ অফিসে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে কোনো

কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আবেদনপত্র জমা নেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে অতিরিক্তি দায়িত্ব হিসেবে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই কর্মী আবেদনপত্র জমা নেওয়া ও তথ্য প্রদান করার কারণে অনেক সময় তার পক্ষে পূরণ করা আবেদনপত্র নির্ভুলভাবে যাচাই এবং আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত নথি যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

স্বপ্রণোদিত তথ্য উন্মুক্তকরণে সীমাবদ্ধতা ও নীতিমালা প্রয়োগে চর্চার ঘাটতি : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে স্বপ্রণোদিত তথ্য উন্মুক্তকরণে সীমাবদ্ধতা এবং এ-সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োগে চর্চার ঘাটতি বিদ্যমান। এই অফিসে সিটিজেন চার্টার, তথ্যবোর্ড, বিলবোর্ড, ফেস্টুন, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন, তথ্যমেলায় তথ্যভান্ডার উপস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে সেবা-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা থাকলেও ডিআইও নেমবোর্ড, অভিযোগ বাক্স, তথ্য প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণে রেজিস্টার খাতা, অভিযোগ জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও যোগাযোগের মাধ্যম, অভিযোগ নিরসনে সরকারি নিয়মানুযায়ী গণশুনানির ব্যবস্থা, স্থানীয় ওয়েবসাইটে পাসপোর্ট সেবা-সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রভৃতি কার্যকর বাস্তবায়নে চর্চার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

পাসপোর্টের সেবার বিভিন্ন ধাপে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

পাসপোর্টের আবেদনপত্র সংগ্রহ : জরিপকৃত সেবাগ্রহীতাদের ৪৯ শতাংশ আনুষ্ঠানিক উৎস (৩৯ শতাংশ পাসপোর্ট অফিস, ৯ শতাংশ ইউডিসি ও ১ শতাংশ অনলাইন) থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে। অপরদিকে ৫১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক উৎস (৪৩ শতাংশ দোকান ও ৮ শতাংশ দালাল) থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে। নিয়মানুযায়ী পাসপোর্ট অফিস থেকে আবেদনকারীদের দুই কপি আবেদনপত্র বিনা মূল্যে সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বরিশাল পাসপোর্ট অফিস সাধারণত দুটির পরিবর্তে একটি আবেদনপত্র সরবরাহ করে থাকে এবং অপরটি ফটোকপি করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে আবেদনকারীদের একাংশের দালালের সঙ্গে যোগাযোগের একটি ঝুঁকি তৈরি হয়। অপরদিকে আবেদনপত্র সংগ্রহে আনুষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে ওয়েবসাইট ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এখনো জনপ্রিয় না হওয়ায় এসব উৎস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহের হার তুলনামূলক কম।

আবেদনপত্র পূরণ : অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণে সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। আবেদনকারীদের একাংশের মতে, অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ব্যবহারবান্ধব নয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অভিজ্ঞতা মতে, অনলাইন আবেদনে সংশ্লিষ্ট লিংক সব সময় কাজ না করা, ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় তথ্য ভিন্ন ভিন্ন লিংকে থাকা এবং লিংকগুলোতে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি, নির্দেশনাবলির কিছু অংশ বাংলায় এবং কিছু অংশ ইংরেজিতে থাকা, অনলাইনে 'পেশা' ঘরটিতে কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শ্রেণিবিন্যাসের অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সত্ত্বেও সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের প্রয়োজনে পাসপোর্ট অফিসে প্রিন্ট কপি জমা দেওয়ার বিধান এবং হাতে লিখে আবেদনের ক্ষেত্রে দুই কপি আবেদনপত্র পূরণ এবং দুটি কপিতেই সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান আবেদনকারীদের কাছে একটি ঝামেলাযুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আবেদনপত্র একটি পূরণ করে অপরটি যে ফটোকপি করা যায়, এ বিষয়ে আবেদনপত্রের হার্ডকপিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার অভাব রয়েছে। সেবাগ্রহীতা জরিপে আবেদনকারীদের একটি বড় অংশ (৯৮ দশমিক ৯ শতাংশ) হাতে লিখে আবেদনপত্র পূরণ করেছে।

অপরদিকে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ না করার কারণ হিসেবে আবেদনকারীরা একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করা যায় তা জানেন না, ২৯ দশমকি ২ শতাংশ অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ঝামেলাপূর্ণ মনে করে (আবেদনসংশ্লিষ্ট লিংক কাজ না করা ও অনলাইনে পূরণ করা সত্ত্বেও আবেদনপত্র পুনরায় প্রিন্ট করে পাসপোর্ট অফিসে জমা দেওয়া ইত্যাদি), ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি না জানা, ৫ দশমিক ৪ শতাংশ ইন্টারনেট সুবিধা না থাকা এবং ২ দশমিক ৪ শতাংশ দোকানে অতিরিক্ত খরচ এড়ানোর জন্য হাতে লিখে আবেদনপত্র পূরণ করেছে।

আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন : পাসপোর্ট প্রক্রিয়ায় সত্যায়ন ও প্রত্যয়নব্যবস্থা সেবাগ্রহীতাদের জন্য হয়রানির একটি অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে। গ্রাম থেকে আসা পাসপোর্ট সেবাগ্রহণকারীদের অনেকেরই শহরে সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার পরিচিত লোক থাকে না। ফলে এসব সেবাগ্রহীতা সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের জন্য দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হন। এই সুযোগে দালালরা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকে। গবেষণাকালীন পর্যবেক্ষণে বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সামনের ফটোকপি ও কম্পিউটারের দোকানে একাধিক সত্যায়নকারীর নামে ভুয়া সিল বানিয়ে দালালদের নিজেদের সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন করতে দেখা গেছে। অপরদিকে আবেদনকারীদের একাংশ দালালদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় সত্যায়নকারীদের একাংশ সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের ক্ষমতাকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে থাকে।

ব্যাংকে পাসপোর্ট ফি জমাদান : বরিশাল সোনালী ব্যাংকের করপোরেট শাখাসহ আরও পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংকে (ওয়ান ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, প্রিমিয়াম ব্যাংক ও ঢাকা ব্যাংক) পাসপোর্টের ফি জমাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা ব্যবহারে সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতার ঘাটতি লক্ষণীয়। বরিশাল সোনালী ব্যাংকের করপোরেট শাখায় পাসপোর্টের স্ক্রলশিট অনলাইনে পাঠানোর ব্যবস্থা না থাকায় দিনের কাজ শেষ করে পরের দিন স্ক্রলশিট পিয়নের মাধ্যমে হাতে হাতে পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করা হয়। ফলে পাসপোর্টের স্ক্রলশিট যাচাই-বাচাই করে নির্ধারিত সময়ে পাসপোর্টের প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের স্ক্রলশিট জমাদানের অনলাইন ব্যবস্থা

রয়েছে। ফলে পাসপোর্ট ফি জমা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষ তা দেখতে পারে এবং পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। বরিশাল সোনালী ব্যাংকের করপোরেট শাখায় দালালের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই শাখায় পাসপোর্ট ফি জমাদানে চিহ্নিত কাউন্টার থাকলেও এই কাউন্টারে পাসপোর্টের ফি জমা নেওয়ার পাশাপাশি টেলিফোন বিল ও ডিডিপির নগদ পেমেন্ট গ্রহণ করা হয়। কাজের চাপে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট আবেদনকারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। ফলে পাসপোর্টের ফি জমাদানকারীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে বেলা একটার পর পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র জমা নেয় না। তাই সেবাগ্রহীতাদের নির্ধারিত সময়ের আগেই পাসপোর্ট ফি জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হয়। এই সুযোগে দালালরা সেবাগ্রহীতাদের প্রভাবিত করে এবং তাদের দিয়ে ব্যাংকের টাকা জমাদানসহ পাসপোর্ট সেবার অন্যান্য কাজ করাতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ শাখার ব্যাংক কর্মকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে দালালির অভিযোগ রয়েছে।

আবেদনপত্র জমাদান : আবেদনপত্র জমাদানে সেবাগ্রহীতারা বিভিন্নভাবে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। যেমন জমাদান কাউন্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের অযাচিত ভুল ধরা, কী ধরনের ভুল হয়েছে তা না জানিয়ে নতুন আবেদনপত্র পূরণের পরামর্শ দেওয়া, নতুন আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেওয়ার পর আবার নতুন করে ভুল ধরা ইত্যাদি। আবার আবেদনপত্র জমা নেওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর কারও কারও আবেদনপত্র ভুল হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ ফেরত দিয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণে ওই একই আবেদনপত্র দালালের মাধ্যমে জমা নিতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, বরিশাল পাসপোর্ট অফিস নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে একমাত্র কাউন্টারের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা নিয়ে থাকে।

প্রি-এনরোলমেন্টে ব্যয়িত সময় ও কারণ : গবেষণায় দেখা যায়, বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে প্রি-এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ বিলম্বের শিকার হয়েছে। বিলম্বের মাত্রা ছিল সর্বনিম্ন ৩০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ৩ ঘণ্ট পর্যন্ত। যারা বিলম্বের শিকার হয়েছেন, তাদের সর্বোচ্চ ৫৪ দশমিক শূন্য শতাংশ ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত, ৬ দশমিক ৯ শতাংশ ১ ঘণ্টা ১ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত, ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত ২০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ২ ঘণ্টা ১ মিনিট বা তার ঊর্ধ্বে অপেক্ষা করতে হয়েছে। যারা বিলম্বের শিকার হয়েছেন, তাদের ৫৪ দশমিক শূন্য শতাংশ দায়িত্বরত কর্মকর্তার অবহেলা এবং ৪৬ দশমিক শূন্য শতাংশ দীর্ঘ লাইন বিলম্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বায়ো-এনরোলমেন্টে ব্যয়িত সময় ও কারণ : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে বায়ো-এনরোলমেন্টে সেবাগ্রহীতাদের ২৬ দশমিক শূন্য শতাংশ বিলম্বের শিকার হয়েছে। বিলম্বের মাত্রা ছিল সর্বনিম্ন ৩০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত। যারা বিলম্বের শিকার হয়েছেন, তাদের সর্বোচ্চ ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত, ১ ঘণ্টা ১ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পর্যন্ত ৪ দশমিক ৪ শতাংশ, ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত ২৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২ ঘণ্টা ১ মিনিট বা তার উর্ধ্বে ১১ দশমিক শূন্য শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। যারা বিলম্বের শিকার হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতায় ৮৬ দশমিক ৭ শতাংশ দীর্ঘ লাইন, ১২ দশমিক ২ শতাংশ দায়িত্বরত কর্মকর্তার অবহেলা এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ সার্ভারের সমস্যাকে বিলম্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পাসপোর্টের সেবায় দালালের দৌরাত্ম্য : বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে সেবাগ্রহীতাদের ৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ দালাল বা অন্যের সহযোগিতা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ দালাল, ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী, ৩ দশমিক শূন্য শতাংশ আনসার সদস্য, ১ দশমিক ৫ শতাংশ ফটোকপি বা কম্পিউটার দোকানে নিয়োজিত ব্যক্তির, ১ দশমিক শূন্য শতাংশ ব্যাংক কর্মচারীর সহযোগিতা নিয়েছেন। সেবাগ্রহীতারা দালালের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সেবার বিভিন্ন ধাপে ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ আংশিক চুক্তি করেছেন। এ ছাড়া গ্রাম থেকে আসা সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ দালালের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে ১৫ থেকে ২০ জন দালাল কাজ করে। তাদের মধ্যে ৬ জন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সক্রিয়।

দালালরা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের একাংশের ছত্রচ্ছায়ায় দালালি কার্যক্রম পরিচালনা করে। বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের দালালির সঙ্গে স্থানীয় নামধারী সাংবাদিক, পুলিশের একাংশ ও স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের একাংশ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। দালালদের একাংশ এসবি পুলিশ ও পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। পাসপোর্টের প্রার্থীদের কাছ থেকে তারা যে অতিরিক্ত অর্থ নেয় তার একটি অংশ পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এসবি পুলিশের একাংশকে দিয়ে থাকে। দালালদের নামে পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফাইলের ব্যবহার করে থাকে। প্রতি কর্মদিবসে দালাল কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রের হিসাব পাসপোর্ট অফিসে সংরক্ষণ করা হয় এবং দিন শেষে হিসাব অনুযায়ী দালালদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করা হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণের কারণ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নতর। যারা সহযোগিতা নিয়েছেন তাদের ৭২ দশমিক ১ শতাংশ বিভিন্ন ঝামেলা ও ভোগান্তি (যেমন দীর্ঘ লাইন, একাধিকবার আসা ইত্যাদি) এড়িয়ে চলা, ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ দালালের সহযোগিতা ছাড়া আবেদনপত্র জমা দিলে কর্তৃপক্ষ জমা নেয় না, ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানার কারণে সহযোগিতা গ্রহণ, ১১ দশমিক ৭ শতাংশ নির্ধারিত সময়ের আগে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য, ৬ দশমিক ১ শতাংশ পুলিশি তদন্তে হয়রানি এড়ানোর জন্য এবং সময়ের অভাবে দালালের সহায়তা নেওয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৪ দশমিক ৬ শতাংশ তথ্যদাতা।

পুলিশি তদন্তকালীন হয়রানি বা অনিয়ম : পাসপোর্টের সেবায় নতুন পাসপোর্ট আবেদনে পুলিশ প্রতিবেদনের ব্যবস্থা সাধারণ আবেদনকারীদের হয়রানির ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবাগ্রহীতা জরিপে নতুন পাসপোর্ট আবেদনে সেবাগ্রহীতাদের ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ পুলিশি তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন এবং তাদের সবাইকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ হিসেবে তাদের গড়ে ৮৯৬ টাকা দিতে হয়েছে।

পুলিশ প্রতিবেদন প্রণয়নে এসবি পুলিশ কর্তৃক আবেদনকারীদের হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে। যেমন আবেদনপত্রে অযথা ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা, আবেদনকারীকে জঙ্গি কার্যক্রম বা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভয় দেখানো, বাড়িতে না এসে চায়ের দোকান বা থানায় ডেকে পাঠানো, নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দাবি করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশি তদন্তের জন্য নিজ উদ্যোগে থানায় যেতে হয়েছে। কারণ সময়মতো এসবি পুলিশ তদন্তে আসেনি অথবা তদন্তের পরও সঠিক সময়ে তদন্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়নি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে পুলিশ প্রতিবেদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোর প্রতি ৩ মাস পর সমন্বয় সভা করার নিয়ম থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটি করা হয় না।

পাসপোর্ট বিতরণ : জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিনে পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব হয়েছে। যাদের অফিস নির্ধারিত দিনে পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব হয়েছে তাদের গড়ে ৮ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। জরিপে তথ্যপ্রদানকারী সেবাগ্রহীতার মধ্যে যারা অফিস নির্ধারিত দিনে পাসপোর্ট পাননি তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ 'নির্ধারিত সময়ে এসএমএস না পাওয়া', ৩০ দশমিক ২ শতাংশ 'কর্তৃপক্ষ বলেছে ঢাকা থেকে পাসপোর্ট আসেনি' ও ৬ দশমিক ৯ শতাংশ 'যথাসময়ে পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট না আসা' বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

অফিশিয়াল নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারীকে নিজে হাজির থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হয়। যদি কোনো কারণে আবেদনকারী হাজির না হতে পারেন, তাহলে তাকে 'পাসপোর্ট গ্রহণের ক্ষমতা হস্তান্তর বা অথরাইজেশন লেটার' দিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। জরিপকালীন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে দালালের কাছে কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট হস্তান্তর করছে।

পাসপোর্টের সেবায় অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতি : সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭১ দশমিক ১ শতাংশ পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতাদের ৫৪ দশমিক শূন্য শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া, ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ সময়ক্ষেপণ ও শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ

আত্মসাৎ ও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পাসপোর্ট সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার গড় পরিমাণ ১ হাজার ৮৫৪ টাকা। গ্রামের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৭ শতাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায়, বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে সেবাগ্রহীতাদের একটি বড় অংশ পাসপোর্টের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দালালের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছেন। দালালের সহায়তা নিতে বাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমাদানে পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক ভোগান্তি ও হয়রানি করা, পাসপোর্ট অফিসের অপর্যাপ্ত সেবা প্রদান, আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান এবং পুলিশ প্রতিবেদন প্রণয়নে পুলিশি তদন্তে এসবি পুলিশ কর্তৃক হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি অন্যতম কারণ হিসেবে এ গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে।

সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যারা গ্রাম থেকে আসা ও কম শিক্ষিত, তাদের দালালের সহযোগিতা নেওয়ার হার বেশি এবং তারা অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। অপরদিকে বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে সেবাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও লজিস্টিকসের কার্যকর ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় অফিসের বিভিন্ন নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেবার বিভিন্ন ধাপে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আলাদা কাউন্টার বা কক্ষের ব্যবস্থা না করা, নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট ও বসার ব্যবস্থা না থাকা, পাসপোর্ট অফিসের অভ্যন্তরে সেবাগ্রহীতাদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা, গণশুনানির কার্যকর বাস্তবায়নে সদিচ্ছার ঘাটতি, তথ্য ও পরামর্শকেন্দ্র পুরোপুরি কার্যকর না হওয়া এবং বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের স্থানীয় ওয়েবসাইটে সেবাসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত সমস্যার পাশাপাশি বরিশাল পাসপোর্ট অফিসে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা–যেমন অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি, পাসপোর্ট সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অচল থাকা এবং বিকল যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি এ অফিসের সুষ্ঠু সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে থাকে।

সুপারিশ

বরিশাল জেলার আপামর সাধারণ জনগণের হয়রানিমুক্ত পাসপোর্ট প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের সার্বিক সেবার মান উন্নয়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বরিশাল পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষ, এলাকার সচেতন নাগরিক সমাজ ও সাধারণ জনগণকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা গেলে এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নত হবে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বরিশাল পাসপোর্ট

অফিসের সেবার মান উন্নত, টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে নিচের সুপারিশ প্রণয়ন করা হলো :

স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১. বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের বিদ্যমান জনবলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আবেদনপত্র জমাদান, প্রি-এনরোলমেন্ট, বায়ো-এনরোলমেন্ট ও বিতরণ কাউন্টারে অফিস চলাকালীন কর্মরত জনবলের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

২. নারী, শিশু, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্ট কাউন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের যেসব অসাধু অংশের যোগসাজশে দালালচক্র তাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাখছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৪. পুলিশ প্রতিবেদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে।

৫. বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের তথ্য ও পরামর্শকেন্দ্র সচল করতে হবে এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন-সংক্রান্ত রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৬. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে।

৭. অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. পাসপোর্ট অফিসের বিদ্যমান ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালু করতে হবে এবং অভিযোগ বাক্স স্থাপন করে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের স্থানীয় ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১০. অনলাইন আবেদনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পাসপোর্টের সেবাসংক্রান্ত বিষয়ে সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে স্থানীয়ভাবে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং এ ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বাস্তবায়নযোগ্য

১১. সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে সব শূন্যপদ পূরণ এবং জনবলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের ব্যবস্থা যেহেতু আবেদনকারীদের জন্য একটি হয়রানির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ ব্যবস্থা পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে, তাই আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান বাতিল করতে হবে।

১৩. পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিধান যেহেতু দুর্নীতির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তাই পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিধান বাতিল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য 'বায়োমেট্রিক ডেটা ব্যাংক' তৈরির পাশাপাশি স্মার্টকার্ড তৈরি ও বিতরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং অপরাধীদের তথ্যসংক্রান্ত 'অপরাধী তথ্যভান্ডার' আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি এই তথ্যভান্ডারের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

টিআইবি, 'পাসপোর্ট সেবা : একটি ডায়াগনস্টিক গবেষণা', ঢাকা, ২০০৬।

টিআইবি, 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫', ঢাকা, ২০১৬।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, *দ্য পাসপোর্ট*, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ ২০১৭, ঢাকা, ২০১৭।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, *দ্য পাসপোর্ট*, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ ২০১৬, ঢাকা, ২০১৬।

http://passport.barisal.gov.bd/

www.dgdip.gov.bd

www.dip.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়

বেসরকারি খাতের সুশাসন

বাংলাদেশের স্বর্ণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি
চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, মো. রেযাউল করিম ও অমিত সরকার

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আবহমানকাল ধরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সহজে রূপান্তরযোগ্য মূল্যবান বস্তু হওয়ায় এটি তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে বিশেষত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের জনপ্রিয় চাহিদার মুখে বাংলাদেশ স্বর্ণালংকার উৎপাদন ও স্বর্ণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পৃথক একটি খাত, যেখানে আজ বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন আনুমানিক ২০ লক্ষাধিক মানুষ।

দেশের স্বর্ণ খাত সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে নির্ভরযোগ্য জরিপ বা গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তবে বিভিন্ন উৎসের হিসাবমতে, দেশে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বার্ষিক সর্বনিম্ন ২০ থেকে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে।[১] অভ্যন্তরীণ চাহিদার আনুমানিক ১০ শতাংশ স্বর্ণ 'তেজাবি স্বর্ণে'র মাধ্যমে (পুরোনো স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বর্ণ থেকে) সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮ থেকে ৩৬ মেট্রিক টন, যার সিংহভাগ চোরাচালানের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। বৈধপথে বছরে এই পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি করা হলে বর্তমান শুল্কহার অনুযায়ী প্রায় ৪৮৭ থেকে ৯৭৪ কোটি টাকা শুল্ক পরিশোধ করা প্রয়োজন।[২] বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহে জটিলতার কারণে এ খাতের ব্যবসায়ীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর, যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। অর্থ পাচার, মানব পাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র পাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার এসব কর্মকাণ্ডকে সহজতর করছে বিধায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে।[৩]

---

*২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যমান নির্ধারণ মূলত ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার বন্ধকের বিনিময়ে পরিচালিত লগ্নি ব্যবসায় সুদের হার ও শর্তাবলি বিষয়ে সরকারের নজরদারির অভাবে এটিও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উচ্চ সুদে পরিচালিত হচ্ছে। তবে দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও নানাভাবে চাঁদাবাজি ও দোকান লুটের ঘটনার শিকার, যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশকে অধিকতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হিসাববহির্ভূত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটকের ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বর্ণ খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও লেনদেন, স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালংকার রপ্তানি, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণবাজার, ভোক্তা ও শ্রম অধিকার, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাবসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি বিরাজমান। তা ছাড়া বৈধ-অবৈধভাবে বিদেশি স্বর্ণালংকারের দেশীয় বাজারে অনুপ্রবেশের ফলে দেশীয় স্বর্ণ খাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেমন স্বর্ণশিল্পীদের পেশা পরিবর্তন ও দেশত্যাগ। সার্বিকভাবে, একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা।[৪]

দেশের স্বর্ণ খাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন, সে লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা যাবে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এ খাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত বা উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণ খাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে টিআইবি গণমাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করে (৯ জুন ২০১৭) এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার একটি স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এই খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ এবং

সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে হিসাববহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটক ও উদ্ধার তৎপরতার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

চিত্র ১ : বার্ষিক আটক স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি)

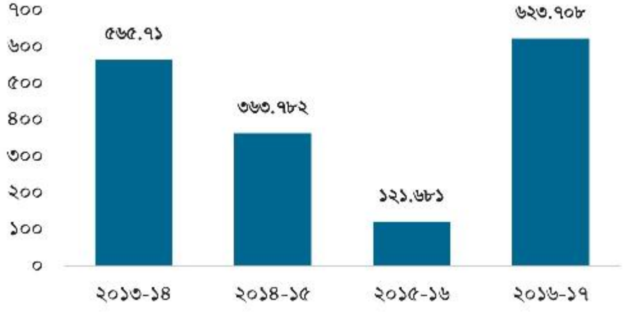

সূত্র : শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ২০১৭।

বাংলাদেশ কাস্টমের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান উদ্যোগ হিসেবে স্থল (বেনাপোল) ও বিমানবন্দরে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) 'মেটাল ডিটেক্টর' ও 'আর্চওয়ে'র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'কার্গো এরিয়া'য় সীমিতসংখ্যক ব্যাগেজ স্ক্যানিং যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জনবল-সংকট নিরসনে বর্তমানে প্রবেশ স্তরে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে এবং এই স্তরে আগের তুলনায় নিয়োগ বৃদ্ধির কথা জানা যায়।[৫]

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, স্বর্ণভিত্তিক বন্ধকি ব্যবসা ও রপ্তানিবিষয়ক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো প্রস্তাবে সহায়ক দিকনির্দেশনা প্রদান, যার ভিত্তিতে স্বর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ, টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বর্ণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিতকরণ। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- স্বর্ণ খাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা।
- স্বর্ণ খাতে বিরাজমান বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- স্বর্ণ খাতটিকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

এ গবেষণায় স্বর্ণ খাতসংক্রান্ত আইনি কাঠামো, স্বর্ণের বাজার, বাণিজ্যিক মজুত, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ আমদানি, স্বর্ণালংকার রপ্তানি, ভোক্তা বা ক্রেতা স্বার্থ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, শিল্পী বা শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রম অধিকার, বন্ধকি ব্যবসা, তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত গুণগত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো– প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যম প্রতিবেদন ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ তথ্য স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অংশীজনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।[৬] গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্য মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (সরাসরি ও টেলিফোনেসহ), ই-মেইল ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা ও আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণাটি জুলাই-নভেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্বর্ণ খাতবিষয়ক আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে স্বর্ণ খাতের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো নীতিমালা নেই। তবে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা, আইন ও প্রজ্ঞাপনে [আমদানিনীতি আদেশ, ২০১৫- ২০১৮[৭]; ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭[৮]; বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ শিডিউল, ২০১৭-২০১৮[৯]; ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭; কাস্টমস আইন, ১৯৬৯; যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬[১০]] স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানিসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের অবৈধ ব্যবসা, পরিবহন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ ও চোরাচালান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিবিধান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যেমন চোরাচালানের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আর এই আইনে কৃত অপরাধ 'প্রগ্রাহ্য (কগনিজিবল) এবং সাধারণভাবে অজামিনযোগ্য'[১১], যা বিশেষ 'ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য'[১২]। স্বর্ণ চোলাচালান প্রতিরোধসংশ্লিষ্ট আইন কঠোর হলেও স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির প্রক্রিয়া কার্যত নিয়ন্ত্রণমূলক ও দুর্নীতির ঝুঁকিপ্রবণ। এ ছাড়া দেশীয় বাজারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বর্ণের মজুত, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার ও শ্রম অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অস্পষ্ট। বিশেষ ক্ষমতা আইনে স্বর্ণ চোরাচালানের মামলাগুলো হওয়ার ফলে ও এই আইনে কঠোর দণ্ডের কারণে মামলার রায় নির্ণয়ে প্রখরভাবে নিশ্চয়তামূলক সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অদক্ষ তদন্ত, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দুর্বল করা হয়। ফলে আসামির সহজে জামিন বা খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। জামিন নেওয়ার পর পুনরায় চোরাচালানে জড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই

পরিপ্রেক্ষিতে আইনজ্ঞদের একাংশ 'বিশেষ ক্ষমতা ১৯৭৪'-এর মতো কঠোর আইন স্বর্ণ চোরাচালানের সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে 'কাস্টমস আইন-১৯৬৯' প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। প্রয়োজনে কাস্টমস আইন ১৯৬৯-এর অধিকতর সংশোধন করা যেতে পারে।

স্বর্ণ খাতের চ্যালেঞ্জ

সুষ্ঠু আমদানিনীতির প্রতিবন্ধকতা : স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির তথা এ খাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি রয়েছে। তবে নীতিমালা না হওয়ার পেছনে চোরাচালান সিন্ডিকেট, কালোবাজারি, বৃহৎ স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন সংস্থার একাংশের মধ্যে যোগসাজশ, প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চোরাচালানের মাধ্যমে লাভজনক অবস্থান বজায় রাখতে তারা এ ধরনের ভূমিকা রাখছেন।

নিয়ন্ত্রণহীন স্বর্ণের বাজার : দেশের স্বর্ণবাজারে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ তথা জবাবদিহির কার্যকর ব্যবস্থা নেই। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সনাতনী স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ ও মান ব্যবসায়ীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ ছাড়া স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থ পাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণবাজারে অবৈধ বিদেশি স্বর্ণালংকরের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসারে, দেশীয় স্বর্ণালংকার শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের একাংশের ভ্যাট ফাঁকি, লাইসেন্স ফাঁকি ইত্যাদি কারণে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুতে জবাবদিহির অভাব : স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে গয়না প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনসংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত রয়েছে, এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান নেই। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কার কাছে কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত রাখা যাবে, এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধিবিধানের অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি নীতি-নির্দেশনা না থাকায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হিসাববহির্ভূতভাবে স্বর্ণ, স্বর্ণালংকার সংগ্রহ ও মজুত করার সুযোগ বিদ্যমান। একটি জুয়েলারি থেকে অপ্রদর্শিত ও হিসাববহির্ভূত প্রায় সাড়ে ১৩ মণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়।[১৩] উল্লিখিত স্বর্ণের মজুত ধরা পড়ার পর এটি প্রতীয়মান হয় যে স্বর্ণ মজুতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে।

মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অনুপস্থিতি : স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের ক্যারেট ও খাদের মান নির্ধারণ এবং তা যাচাইয়ের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি (ল্যাবটেস্ট বা ফায়ার টেস্ট ও হলমার্ক টেস্ট)

ব্যবহার করে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নির্ধারণের জন্য সরকারি মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠান, যেমন 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড' (বিএবি) অথবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে মান ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন ক্যারেটের যে গয়না বিক্রি করা হয় বাস্তবে তাতে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে তা বাজার পর্যায়ে পরীক্ষণ ও তদারকির জন্য সরকার অনুমোদিত ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক খাদ মিশিয়ে ও মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতাদের প্রতারিত করার সুযোগ বিদ্যমান। ২০০৭ সাল থেকে রাজধানীতে বেসরকারি উদ্যোগে তাঁতীবাজারে একটি প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে স্বর্ণ, স্বর্ণালংকারের মান (হলমার্ক স্টিকারযুক্ত) ও খাদ পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করে থাকলেও এটি এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়।

সর্বজনীনভাবে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ লেনদেনের অনুপস্থিতি : আন্তর্জাতিক স্বর্ণ বাজারে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন লেনদেনের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান সমতুল্য সব মানের (ক্যারেট), হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত নয়। গবেষণায় দেখা যায়, দেশীয় বাজারে সর্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক মানসমতুল্য এবং হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের লেনদেনের আইনি বাধ্যবাধকতাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো না থাকায় ক্রেতাসাধারণের প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি বিদ্যমান।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই : স্বর্ণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্বর্ণ আমদানি অপরিহার্য হলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে স্বর্ণ আমদানির ব্যবসায়ী কিংবা সরকার নির্ধারিত কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সরকার নির্ধারিত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়।

আমদানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও নেতিবাচক প্রণোদনা : শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে বৈধভাবে আমদানির দৃষ্টান্ত নেই। একজন ব্যবসায়ীকে ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন অনুযায়ী বিশেষ 'কনসাইনমেন্ট'-এর আওতায় (সব নথি জমাদান সাপেক্ষে) তিনটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) পৃথক পৃথক তদন্ত বা অনুসন্ধান সাপেক্ষে ছাড়পত্র পেতে এক থেকে দেড় বছর অপেক্ষা করতে হয়।[১৪] ওই সময়ের মধ্যে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম সচরাচর পরিবর্তন হওয়ায় এলসি খুলে স্বর্ণ আমদানি ব্যবসায়ীদের কাছে অজনপ্রিয়। আবার চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ সংগ্রহ করার সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহী না হওয়ার একটি কারণ হিসেবেও কাজ করে।

স্বর্ণ বহনকারী যাত্রীর আগমন-সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণব্যবস্থার অনুপস্থিতি : দেশের সব স্থল ও বিমানবন্দরে 'ব্যাগেজ রুল'-এর আওতায় নিয়ে আসা বা বহন করা স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণবার-সম্পর্কিত তথ্য কোনো তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত রাখার এবং এর বিপরীতে রসিদ প্রদানের ব্যবস্থা

নেই। ফলে ব্যবসায়ীদের একাংশ তাদের কাছে থাকা সব অবৈধ স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে আনা বলে চালিয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।

স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপের ঘাটতি : রপ্তানিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় তথা বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াত বা ভর্তুকির কার্যকর ব্যবস্থা নেই। রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউস' পদ্ধতি সুপারভাইজারের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিমত।

আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবস্থার অপ্রাপ্যতা : বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হলো এ ক্ষেত্রে কোনো বেসরকারি ফ্রেইট ও ইরস্যুরেন্স পাওয়া যায় না। বিমানবন্দরগুলোর স্টোর (হ্যাঙ্গার) থেকে পণ্য চুরি, হারানো, দ্রুত খালাস না হওয়া, চালানের প্যাকেট অক্ষত অবস্থায় গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণে বিমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) কোম্পানি স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনে আগ্রহ দেখায় না।

ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনাবেচা না হওয়া : স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকারের পাইকারি ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা মূসক চালানের ব্যবহারের প্রচলন হয়নি। এ ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাংকিং চ্যানেলে অথবা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থ পাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে।

বিধিবহির্ভূত স্বর্ণ লগ্নি ব্যবসার সুযোগ : রাজধানীর তাঁতীবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদে (বার্ষিক হিসাবে প্রায় ৩০ থেকে ৪৮ শতাংশ) অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বর্ণ লগ্নি ('বন্ধকি') ব্যবসার প্রচলন রয়েছে।

চোরাচালানের ঝুঁকি : চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধসংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। রাজনৈতিক পরিচয়, সংযোগ ও প্রভাবে চোরাচালান সিন্ডিকেট চোরাচালান কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে বিমানবন্দরভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে পুনরায় একই কাজে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন বন্দরে স্বর্ণ চোরাচালানের মামলায় নেপথ্যে থাকা ব্যক্তি ও অর্থলগ্নিকারীদের আটক ও বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উদাহরণ বিরল।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি : আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের মালামাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও

বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগের অভাবে অদ্যাবধি এ ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া বিমানবন্দরের প্রতিটি আগমন ও বহির্গমন পথে স্ক্যানার ও আর্চওয়ে নেই। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হলেও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ও সময় উপযোগী নয়। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কনটেইনার ও যানবাহন তল্লাশির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার' থাকলেও ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তা নেই। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্তৃক বিমানের বর্জ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের যথাযথ পরীক্ষা ছাড়া বিমানবন্দর ভবনের বাইরের প্রবেশ পথ দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের বৃহৎ চালান বিমানবন্দর এলাকা পার হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয় : স্বর্ণ চোরাচালান ও স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, যেমন বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুদক, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড ইত্যাদির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি থাকার অভিযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চোরাকারবারিদের অবৈধ পণ্যসহ গ্রেপ্তার করলেও এবং কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও মামলা পরিচালনায় কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আদালত থেকে জামিন লাভ করার পাশাপাশি বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নথি আদান-প্রদান, দ্রুত গোয়েন্দা যোগাযোগ, তথ্য বিনিময়, তদন্ত কার্যক্রম, অভিযান ও মামলা পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

স্বর্ণ শিল্পী বা শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ : শিল্পী বা শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে বঞ্চনা, নির্ধারিত কর্মঘণ্টার অনুপস্থিতি, অস্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের অভিযোগ রয়েছে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি : বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় কার্যত কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। স্বর্ণের দোকানে ওজনমাপক যন্ত্রের সঠিকতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) বছরে একবার পরিদর্শন করে থাকে। ওজনমাপক যন্ত্র বেসরকারিভাবে সরবরাহকৃত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যমানের এবং স্বর্ণালংকারের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম ওজনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ উপযুক্ত নয়। পাশাপাশি স্বর্ণালংকারের বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে স্বর্ণের মান (ক্যারেট), বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর ও মূল্য, মিশ্রিত খাদের পরিমাণ, ভ্যাট এবং শিল্পী বা শ্রমিকদের মজুরি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় না। কারিগরি সক্ষমতায় (বিশেষ করে খাদ নির্ণয় ও ওজন নির্ধারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির) ঘাটতি ও বাজার পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর উদ্যোগের অভাবে স্বর্ণালংকারের মান নিয়ন্ত্রণ ও ওজন পরিমাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভোক্তাস্বার্থবিষয়ক তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যাহত হওয়ার অভিমত রয়েছে। এমতাবস্থায় সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতারা

বিভিন্নভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন স্বর্ণালংকার বিক্রির সময় সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ধার্য করা মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া; নিম্নমানের স্বর্ণালংকার উচ্চমানে তথা উচ্চমূল্যে কিনতে বাধ্য হন।

তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও গবেষণা : দেশের স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট তথ্য যেমন বার্ষিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকানসংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার নেই। সারা দেশের বিভিন্ন স্থল ও বিমানবন্দরে সারা বছর কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটক হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ীভাবে জমা রাখা হয়, তা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া স্বর্ণ খাতের ওপর গবেষণার অভাব রয়েছে।

স্বর্ণ খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু উদাহরণ

ব্যবসায়ীদের দ্বারা একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ : বাজারে স্বর্ণের মূল্য মূলত ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রভাবের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জুয়েলারি সমিতির তরফ থেকে বলা হয় 'বিশ্ব বাজারে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশে দাম বৃদ্ধি করা হলো'। স্বর্ণের উচ্চ মূল্যের ফলে এই খাতের সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হলেও সার্বিকভাবে খাতটির ওপর, বিশেষ করে স্বর্ণশিল্পী বা কারিগর ও সাধারণ ক্রেতাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে চোরাপথে অনুপ্রবেশকৃত স্বর্ণালংকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত স্বর্ণালংকার। স্বর্ণ ব্যবসায় একদিকে যেমন নিম্নমানের স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীদের অভিপ্রায় মোতাবেক উচ্চ মূল্যে বিক্রির নজির রয়েছে, তেমনি ব্যক্তিপর্যায়ে সাধারণ মানুষ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার বিক্রির সময় সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক ধার্যমূল্যে বিক্রি করতেও বাধ্য হন। এ ছাড়া স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে ব্যবসায়ীদের একাংশ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে 'গোল্ড ডিলিং লাইসেন্স' ও 'মানি লেন্ডিং লাইসেন্স' গ্রহণ ও নিয়মিত নবায়ন না করায় সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

হলমার্ক সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের লেনদেন না হওয়া : আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্রয়-বিক্রয়কৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারে ক্যারেটপ্রতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২২ ক্যারেট স্বর্ণে ৯১ দশমিক ৬৭ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতির নিয়ম ও প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ক্রেতারা তা থেকে বঞ্চিত হন। এর পেছনে মূল কারণ হলো স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিংয়ের বাধ্যবাধকতা না থাকা, এ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থার পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকা এবং পরীক্ষা অনুযায়ী হলমার্ক চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন না থাকা।

স্বর্ণ ও অবৈধ স্বর্ণালংকার আমদানিতে অনিয়ম : দেশের জুয়েলারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শোরুমের বেশির ভাগ স্বর্ণালংকার বিশেষ করে চেইন, হাতে ব্যবহার্য গয়না ও অন্যান্য ভারী গয়নার সেট

মূলত বিদেশ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ বাহকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্বর্ণালংকার অবৈধভাবে বিদেশ থেকে দেশে এনে বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং চোরাচালান চক্রের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আনা স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যাগেজ রুলের আওতায় সংগ্রহ করার দাবি করেন।

ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগ : ব্যাগেজ রুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী বা ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরাসহ নিজস্ব লোক বা বাহক মারফতে নিয়মিতভাবে স্বর্ণালংকার দেশে এনে ও চোরাচালানের মাধ্যমে আনা স্বর্ণালংকার স্বর্ণের দোকানে বা শোরুমে ওঠানোর পর ব্যাগেজ রুলের আওতায় তা সংগ্রহ করা হয়েছে—এই যুক্তিতে অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন।

আমদানি শুল্ক ফাঁকি : বৈধ পথে আমদানি না হওয়ায় স্বর্ণ খাতে সরকারের ন্যূনতম রাজস্ব ক্ষতি বার্ষিক ৪৮৭-৯৭৪ কোটি টাকা। তবে সংশ্লিষ্ট সবার মতে, এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। শুল্কহার অর্ধেক কমিয়ে এনে বৈধপথে স্বর্ণ আমদানির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের আয় ২৩০ থেকে ৪৬৬ কোটি টাকা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

ভ্যাট ফাঁকি : স্বর্ণালংকার ব্যবসার একটি বড় অংশ ভ্যাটের আওতার বাইরে রয়েছে। আর যারা ভ্যাটের আওতায় এসেছেন, তাদের একাংশের বিরুদ্ধে ভ্যাট আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশে ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। ভ্যাটসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রি করলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ গ্রাহককে ভ্যাট চালানের রসিদ দিতে অনাগ্রহী।

স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার চোরাচালান কর্মকাণ্ড : চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার সংগ্রহ করার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহী নন। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার-সম্পর্কিত কিছু পর্যবেক্ষণ :

অবৈধ উপায়ে প্রবেশ : বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইরান, কাতার, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জর্দান, লেবানন, মিসর, ওমান, ইয়েমেন, বাহরাইন ইত্যাদি দেশ থেকে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার অবৈধভাবে বাংলাদেশ বিমান ও দেশীয় বিভিন্ন বেসরকারি বিমান সংস্থার মাধ্যমে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দ্বারা দেশে প্রবেশ করে।

পাচার-কৌশল : স্বর্ণের ক্ষুদ্র চালানগুলো (এক কেজির কম) ব্যক্তিপর্যায়ে বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিক, সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে নানা কৌশল প্রয়োগ করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, বৃহৎ চালান বিমানের কাঠামোসহ লাগেজের

সঙ্গে বিমানবন্দরে আনা হয়। অতঃপর বিমানের বর্জ্য তথা বর্জ্যবাহী মোটরযান, প্রভাবশালীদের একাংশের সঙ্গে থাকা যানবাহনের মাধ্যমে বিমানবন্দর এলাকা পার করার অভিযোগ রয়েছে।

ভারতে পাচারের অভিযোগ : বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ পাচারে মূলত বেনাপোল, সোনা মসজিদ ও বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিভিল এভিয়েশন, বিমানের কর্মীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর একাংশের যোগসাজশে ও প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে।

তল্লাশির ক্ষমতা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা : শুল্ক কর্মকর্তাদের সর্বত্র তল্লাশির ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অজুহাত (হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, গ্রাউন্ডিং চার্জ) তথা বাধার কারণে বিদেশ থেকে আসা বিমানের কার্গোহোলে ক্ষেত্রবিশেষে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

আটক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের যথাযথ মূল্যায়ন না করা : বিগত চার অর্থবছরে বিমানবন্দরে আটক স্বর্ণের পরিমাণ ১ হাজার ৬৭৪ দশমিক ৮৮১ কেজি (বছরপ্রতি ৪১৮ দশমিক ৭২ কেজি)। তবে সংশ্লিষ্ট সবার মতে, এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও চোরাচালান প্রতিরোধসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে, স্বর্ণ আমদানির প্রক্রিয়াকে ব্যবসাবান্ধব না করে শুধু স্থল ও বিমানবন্দরের অভ্যন্তরস্থ গ্রিন চ্যানেলে আটক তথা অবৈধ বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা অযৌক্তিক। বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আটককারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য বাহকের মধ্যে বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরভিত্তিক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আটক অবৈধ স্বর্ণের ক্ষেত্রে বাহকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধযোগ্য শুল্ক সমপরিমাণ অর্থমূল্য সঙ্গে না থাকলে বিধান মোতাবেক 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' উভয়টি ইস্যু না করে শুধু 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর অভিযোগ রয়েছে। পরে বাহকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য আটককারী কর্মকর্তা ও কর্মীর যোগসাজশে বিধিবহির্ভূত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে আটক পণ্যের পরিমাণ, ধরন ও মান পরিবর্তন বা হ্রাস দেখিয়ে পণ্য মূল্যায়নপত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

> "এই অর্থ বিষয়ে আপনাদের কিছু বলা যাবে না। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এনবিআর থেকে পেয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রয়েছে। এই অর্থ ব্যয় নিরীক্ষামুক্ত। আমরা সোর্সমানি সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলব না এবং এ বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য নই। আপনাদের (বর্তমান গবেষণা দল) এ বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। আপনারা এ বিষয়ে কিছু লিখবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে এনবিআরের চেয়ারম্যান ছাড়া কারও কাছে কিছু বলতে আমি বাধ্য নই।"
>
> *সূত্র :* শুল্ক আদায় ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার, ৬ নভেম্বর ২০১৭।

'সোর্সমানি' হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের সুযোগ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রকৃত সোর্সকে বাস্তবে কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া বা আদৌ দেওয়া হয় কি না, তার যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া চোরাচালান প্রতিরোধসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশকে এ বিষয়ে কোনো প্রকার তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। শুল্ক কর্মকর্তাদের একাংশ নিজেদের মধ্যে যোগসাজশে বেশি পরিমাণে সোর্সমানি পাওয়ার লক্ষ্যে আটক স্বর্ণের পরিমাণ বেশি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ১ : একনজরে স্বর্ণ খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অনুপস্থিতি • মান পরীক্ষণ ব্যবস্থা ও হলমার্ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা না থাকা • বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি • ব্যাগেজ রুলে অস্পষ্টতা • আমদানিতে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, উচ্চ শুল্কহার • চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি • অনিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিহীন স্বর্ণবাজার • ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী বা শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি • রপ্তানি প্রণোদনা ও উদ্যোগের অভাব • কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও গবেষণার অনুপস্থিতি	• বৈধপথে আমদানি না হওয়া • কালোবাজারনির্ভর স্বর্ণবাজার • অবৈধ বিদেশি স্বর্ণালংকারের বাজার প্রসার • আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের সহযোগিতায় স্বর্ণের চোরাচালান অব্যাহত • ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ • হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয়ের চর্চা নেই • ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি • স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের ওপর তথ্যের অনুপস্থিতি • রাজস্ব ফাঁকি, ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী বা শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনা • অভিযুক্ত ব্যক্তির সহজে জামিন লাভ ও পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়া	• দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ • সম্ভাবনা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিকাশ না হওয়া • স্বর্ণ খাতের টেকসই বিকাশ ব্যাহত • অর্থ পাচার, মানব পাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র পাচার ইত্যাদির ঝুঁকি বৃদ্ধি • আর্থসামাজিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি

চোরাচালানের লেনদেনে স্বর্ণের ব্যবহার : বাংলাদেশ-ভারত আন্তরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে অবৈধ লেনদেন, যেমন অবৈধ মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র, গবাদিপশু, পরিধেয় পোশাক, কাপড়, মাদক ইত্যাদি লেনদেনের পরিশোধিত অর্থমূল্যের নিরাপদ, সহজে বহনযোগ্য, স্থিতিশীল মুদ্রার মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ : সার্বিকভাবে স্বর্ণ খাতের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের বাজার ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থলবন্দর ও বিমানসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের যোগসাজশ ও সম্পৃক্ততায় স্বর্ণ

চোরাচালানের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। দেশে একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানিনীতি প্রণীত না হওয়া এবং চোরাচালান বন্ধ না হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবশালী, চোরাচালান চক্র, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের একাংশের প্রভাব রয়েছে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান যাচাই, ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়া ও স্বর্ণ শিল্পী বা শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহমূলক পদক্ষেপের অভাবে রপ্তানি শিল্প হিসেবে স্বর্ণ খাতের বিকাশ হয়নি। বিদ্যমান আইনে চোরাচালানের অপরাধে ন্যূনতম দুই বছর থেকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগ ও অপরাধীদের সাজা প্রদানের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল। এমতাবস্থায় দেশের স্বর্ণ খাত জবাবদিহিহীন, হিসাববহির্ভূত, কালোবাজারনির্ভর এবং এ খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি বিরাজমান।

সুপারিশমালা

দেশের স্বর্ণ আইনি কাঠামো, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আওতায় আনাসহ এ খাতে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে টিআইবি একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণের সুপারিশ করছে, যার মধ্যে নিচের উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে :

১. **স্বর্ণ খাতকে একটি পূণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা :** স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে। কর প্রদান সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিষ্ঠানের মজুত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ওই নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সব ব্যবসায়ীকে সরকারনির্ধারিত লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত লাইসেন্স অনুমোদন পদ্ধতি ও ফি পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

২. **স্বর্ণের বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ :** স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকারের পাইকারি ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্ব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর বা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার বা মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন করতে হবে। স্বর্ণবাজারে অবৈধ বিদেশি স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার বন্ধে নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ ও হিসাববহির্ভূত স্বর্ণ জব্দ করতে হবে।

৩. **বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত :** সর্বশেষ বছরের বিক্রীত স্বর্ণের বিপরীতে ইসিআর বা মূসক চালানে উল্লিখিত স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করার বৈধতা প্রদান এবং নির্ধারিত পরিসীমার অতিরিক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মজুত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বর্ণ ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি নির্ধারিত

সময় অন্তর ওই ওয়্যার হাউসের খোলা বাজারে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. **স্বর্ণের মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ**

ক. **মান পরীক্ষার ব্যবস্থা :** সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণের মান যাচাই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. **হলমার্ক চিহ্নের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা :** আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত সব মানের (ক্যারেট) স্বর্ণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রচলন নিশ্চিত করতে হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতি ভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণের উপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়ের রসিদে উল্লেখ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. **স্বর্ণের বাজার পরিবীক্ষণ :** স্বর্ণালংকারে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নিশ্চিতকরণ ও বাজার পর্যায়ে তা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে। মান বিচ্যুতির ক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৫. **স্বর্ণ আমদানি**

ক. **পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস ও আমদানি অবাধকরণ :** বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির মাধ্যমে দেশের স্বর্ণ খাতে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনতে হবে। রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে।

খ. **ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি :** বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে নিবন্ধনধারী স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে, সর্বশেষ অর্থবছরে লেনদেনকৃত স্বর্ণালংকার বিক্রির পরিমাণের (ইলেকট্রনিক রেকর্ড বা মূসক চালান অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হবে। অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক প্রয়োজনে স্বর্ণের ক্রয়মূল্য সমন্বয় করে (বাড়িয়ে) স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

বিধিবহির্ভূতভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকবিশেষের লাইসেন্স বাতিলসহ কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা কার্যকর প্রয়োগ

ক. **যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা :** দেশীয় স্বর্ণালংকারশিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিদ্যমান বিধান সংশোধন করতে হবে। বিনা শুল্কে যাত্রীপ্রতি বার্ষিক সর্বাধিক দুবার সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম করে স্বর্ণালংকার আনার সুযোগ দিতে হবে। বন্দরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাত্রীর আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালংকার-সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও রসিদ দিতে হবে। শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে মূল্য সমন্বয় ও শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বৈধ ব্যবসায়ীর পক্ষে অন্য কেউ বাহক হিসেবে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারবে না। এই সুযোগের অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

খ. **ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগ রোধ :** ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে আনা স্বর্ণের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার

ক. **রপ্তানি সনদ :** সব ধরনের ফি অনলাইনে জমা ও 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'-এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি সনদ দিতে হবে। সনদপ্রাপ্ত কেউ আইনবহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত হলে সনদ বাতিল করতে হবে।

খ. **রেয়াত ও ভর্তুকি :** স্বর্ণালংকার রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদের স্বর্ণালংকার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক বিশেষ ভর্তুকি বা সহায়তা দিতে হবে। স্বর্ণালংকার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

গ. **স্বর্ণালংকারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয় :** সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালংকারে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অপচয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ. **'সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউস' পদ্ধতির অবলুপ্তি :** এই পদ্ধতিতে সুপারভাইজারের (সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) একক ও ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতাসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি থাকায় এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে হবে।

ঙ. **রপ্তানি প্রক্রিয়ায় প্রণোদনা :** রপ্তানিমুখী স্বর্ণশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক

ব্যবস্থায় বিশেষ প্রণোদনা, যেমন হ্রাসকৃত কর, দ্রুত ও সহজ শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা ইত্যাদি দিতে হবে। স্বর্ণালংকার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এ ছাড়া রপ্তানির আড়ালে চোরাচালানের ঘটনা প্রতিরোধে এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সমন্বিতভাবে তথ্য সংরক্ষণ, রপ্তানির আগে স্বর্ণালংকার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

৮. **পরিবহন (ফ্রেইট) ও বিমা সমস্যার সমাধান :** সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তাধীন হাই ভ্যালু কার্গোর, যেমন মুদ্রা, পাসপোর্ট পরিবাহী কনটেইনার বিশেষ ব্যবস্থায় আমদানি করা হয় অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে অবাধ স্বর্ণ আমদানি সম্ভব করে তোলার লক্ষ্যে বিমা ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠান বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনের জন্য সম্মত হওয়ার সহায়ক পরিবেশ, যেমন বন্দরে মালামাল চুরি, হারানো, নষ্ট হওয়া ও অযথা সময়ক্ষেপণ হ্রাস ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ :** সরকারনির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের মতো মুনাফাভিত্তিক গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন করা যেতে পারে। ব্যাংক বা ডাকঘরের মাধ্যমে তা দ্রুত ভাঙানোর নিশ্চয়তা থাকবে। এ ক্ষেত্রে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যেন গোল্ড বন্ড ভাঙানোর সময় গ্রাহক সাধারণ সঞ্চয় ও বন্ডের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি মূল্য পান।

১০. **স্বর্ণ লগ্নি ব্যবসাকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা :** দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চসুদের (বছরে ৩০ থেকে ৪৮ শতাংশ) 'বন্ধকি' ব্যবসাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। বন্ধকি ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বর্ণালংকারের বিপরীতে অর্থঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা :** স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২. **ভোক্তাস্বার্থ নিশ্চিতকরণ :** ক্রয়কৃত স্বর্ণালংকারে বাধ্যতামূলকভাবে, বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে মান (ক্যারেট) অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর, খাদের পরিমাণ, পাথর, মজুরি ও ভ্যাটবাবদ মোট মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশ মেমো) সঙ্গে স্বর্ণালংকারের হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৩. কার্যকর বাজার পরিবীক্ষণ : শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বাড়িয়ে (স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান, ওজন, খাদ ও উৎসস্থল ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম) বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে স্বর্ণের দোকানে নিয়মিত ইনভেন্টরি অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

১৪. স্বর্ণ শিল্পী বা কারিগর বা শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার : স্বর্ণ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী বা কারিগর ও শ্রমিকরা যেন ন্যায়সংগত চুক্তিমূল্য ও পারিশ্রমিক বা মজুরি পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া কারিগর বা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্বর্ণের ব্যবসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি, যেমন মালিকপক্ষ কারিগরদের সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

১৫. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ক. **সক্ষমতা বৃদ্ধি :** স্থল ও বিমানবন্দরের আগমনী-বহির্গমন দরজায় সর্বাধিক প্রযুক্তির স্ক্যানার ও আর্চওয়ে (বিশেষ করে জার্মানির তৈরি) স্থাপন এবং শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের মালামাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কনটেইনার বিমান আরোহীদের খাদ্য, পানীয় ও মালামাল (কার্গো), বর্জ্য ও বর্জ্যবাহী মোটরযান ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের (ইউরোপে তৈরি) আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। চোরাচালান প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিমানবন্দরভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট সংস্থার জনবল যৌক্তিক পরিমাণে (নারী কর্মীসহ) বৃদ্ধি করতে হবে।

খ. **কাস্টমস আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ :** শুল্ক আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'চোরাচালানের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ'[১৫] থেকে আসা বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে শুল্ক কর্মকর্তা ও অনুরূপ সংস্থা কর্তৃক বিনা বাধায় কার্গোহোলসহ বিমানের যেকোনো স্থান, বিমানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিনা বাধায় তল্লাশির ক্ষমতা (শুল্ক আইনে প্রদত্ত) প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় :** স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, যেমন বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর, দুদক ইত্যাদির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য আটক সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত কার্যক্রমে পুলিশের পাশাপাশি আটককারী সংস্থা দ্বারা সমন্বিত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভিযোগপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. আটক পণ্য মূল্যায়ন : আটক পণ্যের বিপরীতে ধার্যকৃত অর্থ বাহকের সঙ্গে না থাকলেও শুল্ক মূল্যায়ন সাপেক্ষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একইসঙ্গে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর বিষয়টির স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এর অন্যথা হলে শাস্তির বিধানসহ এসব বিষয় কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের তথ্য উন্মুক্তকরণ : প্রতি মাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের পরিসংখ্যানগত হিসাব ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবছর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা করতে হবে।

চ. 'সোর্সমানি' ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ : রাষ্ট্রীয় অর্থ হওয়ায় চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার জন্য বরাদ্দকৃত 'সোর্সমানি' যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক বরাদ্দ ও বণ্টনকৃত (ব্যয়িত) 'সোর্সমানি'র পরিসংখ্যানগত তথ্য (সোর্সের নাম-ঠিকানা গোপন রেখে) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

ছ. প্রণোদনা প্রদান : বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অধিক হারে এবং সরকারপক্ষ মামলায় জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের একটি যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা দিতে হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় হলে বা অপব্যবহার করলে নেতিবাচক প্রণোদনা, যেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

জ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্নকরণ : আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালত থেকে যাতে সহজে জামিন না পায়, তা তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঢালাওভাবে সব স্বর্ণ চোরাচালানের মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় দায়েরের পরিবর্তে চোরাচালানের পরিমাণসহ গুরুত্ব বিবেচনার ভিত্তিতে 'কাস্টমস আইন ১৯৬৯'-এর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের বিধান সৃষ্টি করতে হবে।

১৬. আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ : সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতামূলক চুক্তি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশের সব প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার কার্যকর করতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৭. **'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা :** স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৮. **স্বর্ণ খাতের তথ্য সংরক্ষণ :** দেশের স্বর্ণ খাতসংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে বার্ষিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকানসংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্ত স্বর্ণ ও নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৯. **স্বর্ণ খাতের ওপর গবেষণা :** সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে স্বর্ণ খাতের ওপর সামগ্রিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, বিদ্যমান সমস্যা ও সে সবের কার্যকর প্রতিকার চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের উপায় চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যম কর্তৃক সহায়ক ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২০. **স্বর্ণনীতি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ :** সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। ওই টাস্কফোর্স প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও স্বর্ণ খাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। সর্বোপরি, এ কমিটি স্বর্ণনীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

২১. **খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণ :** একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে হবে। সর্বোপরি এই নীতিমালা স্বর্ণসহ সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর, যেমন হীরা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

[১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ নভেম্বর ২০১৭।

[২] গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক।

[৩] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৪ জুলাই ২০১৭।

[৪] রুবেল পারভেজ, 'তাঁতীবাজারের স্বর্ণশিল্প', *বণিক বার্তা*, ৩ জুলাই ২০১৫। http://bonikbarta.net/bangla/news/2015-07-03/41780/তাঁতীবাজারের স্বর্ণশিল্প-/; হামিদ বিশ্বাস, '৯৬

হাজার স্বর্ণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান অবৈধ', *বণিক বার্তা*, http://www.mzamin.com/details-archive2016.php?mzamin=4067(১১ নভেম্বর, ২০১৬)।

[৫] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ২১ জুলাই ২০১৭।

[৬] এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ ও ফরেন রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট), বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), শুল্ক গোয়েন্দা এবং তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি), এয়ারপোর্ট কাস্টমস, কাস্টম হাউস, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি, বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও মান যাচাইসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.) প্রতিনিধি, স্বর্ণ লগ্নি ব্যবসায়ী, জুয়েলারি মালিক, কারিগর বা শিল্পী ও কর্মী, পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ট্রাভেল এজেন্সি, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, বিশ্লেষক ও আইনজীবী।

[৭] ষষ্ঠ অধ্যায়, ধারা ২৬, উপধারা ২২, *আমদানিনীতি আদেশ, ২০১৫-১৬*, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ১৩৬২।https://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Import_policy_2015-2018%20(Bangla).pdf. (১৬ অক্টোবর ২০১৭)।

[৮] *ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭*। এ আইনটি ২০১৫ সালে *ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৫* নামে সংশোধন করা হয়েছে। National Board of Revenue Segunbagicha, Dhaka National Customs Tariff

[৯] 'ন্যাশনাল কাস্টমস ট্যারিফ, ২০১৭-১৮ অর্থবছর', জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, https://customs.gov.bd/files/TRF1718V2_TTI.pdf. (১৭ অক্টোবর ২০১৭)।

[১০] http://nbr.gov.bd/uploads/rules/9.pdf; http://nbr.gov.bd/uploads/sros/144_Baggage_Rule_Amend.pdf. (২৯ অক্টোবর ২০১৭)।

[১১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪*, ধারা ৩২।

[১২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪*, ধারা ২৬।

[১৩] 'আপন জুয়েলার্স থেকে আটক সাড়ে ১৩ মণ স্বর্ণ জব্দ,' দৈনিক ইত্তেফাক, ০৩ জুন ২০১৭।

[১৪] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৩ নভেম্বর ২০১৭।

[১৫] সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ*

নাজমুল হুদা মিনা

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত।[১] এ দুর্ঘটনার পর দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবির (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং ৫৪টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। এ গবেষণা ৩টিতে দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী চার বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি রানা প্লাজা-পরবর্তী গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনায় এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মী, কারখানার মালিক, পোশাকশ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং

---

*২০১৮ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কাছ থেকে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ফলাফল এ খাতের অন্যতম অংশীজন বিজিএমইএর সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে উপস্থাপন ও পরবর্তী সময়ে লিখিত ফিডব্যাক গ্রহণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও হালনাগাদ করা।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৮ সালের গবেষণায় ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে ৩৯ শতাংশ (৪০টি), চলমান অগ্রগতি হয়েছে ৪১ শতাংশ (৪২টি) ও বাস্তবায়ন স্থবির বা ধীরগতিতে হচ্ছে ২০ শতাংশ (২০টি)।

চিত্র ১ : বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা

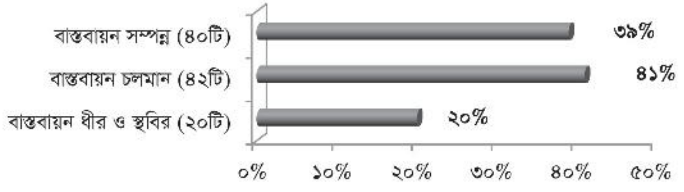

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অগ্রগতি

আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ

সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে, সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিকপক্ষকে না দেওয়া, ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতিতে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধানসহ প্রভৃতি ধারা সংশোধন করা হয়।[২] ২০১৫ সালে 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়, বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের ভেতর সব কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় আদেশের শূন্য দশমিক ০৩ শতাংশ দিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনসহ বিভিন্ন বিষয় বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩] এ ছাড়া, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন এবং অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ অনুমোদন করা হয়েছে। সর্বশেষ তৈরি শিল্পকে বস্ত্রশিল্পের আওতায় রেখে খসড়া বস্ত্র আইন, ২০১৭ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়েছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সিআইডির দায়েরকৃত মামলায় ৪১ জনের বিরুদ্ধে এবং দুদকের দায়েরকৃত তিনটি মামলার একটিতে চার্জশিট প্রদান করা হয়। দুদকের একটি মামলায় ২০১৮-এর মার্চে রানার প্লাজার মালিকের তিন বছর ও তার মাকে অবৈধ অর্থ রাখার দায়ে ছয় বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অপরদিকে,

২০১৫ সালে তাজরীন ফ্যাশনস মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবার ২০১৬ সালে প্রস্তাবিত করপোরেট কর পোশাকমালিকদের জন্য ২০ থেকে ১২ শতাংশ এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির জন্য ১০ শতাংশ[৪], প্রস্তাবিত উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ করা, অগ্নিনিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫ শতাংশ ডিউটির ব্যবস্থা নির্ধারণ করা এবং বন্দর সেবাগ্রহণের জন্য ১৫ শতাংশ প্রচলিত ভ্যাট মওকুফ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর ২০১৪ সালে এবং শ্রম পরিদপ্তর ২০১৭ সালে পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। শ্রম অধিদপ্তর আধুনিকীকরণের জন্য আইএলওর সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্ট্রি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) প্রণয়ন করা হয়েছে। অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহী গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সব প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিএমইএ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং ইনহ্যান্স প্রজেক্টের (এসটিইপি) আওতায় ৫ হাজার শ্রমিক এবং আইএলও ও এইচঅ্যান্ডএমের সহযোগিতায় বিজিএমইএর তত্ত্বাবধানে 'দ্য সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির (সিইবিএআই) আওতায় শ্রমিক ও মধ্যম পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সব কার্যক্রম ডিজিটালাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য আইএলওর সহযোগিতায় 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন'-এর (এলআইএমএ) প্রবর্তন, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানার লাইসেন্স অনুমোদন ও নবায়ন, শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন করা এবং রাজউকের কারখানা, ভবনের ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ২২ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন এবং আইএলওর পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ৫টি দেশ ও জাতিপুঞ্জের (আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্যের), বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে '৫+৩' নামক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি শক্তিশালীকরণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল

পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে সামাজিক জবাবদিহি নিশ্চিতে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। বায়িং হাউসগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া নীতি তৈরি করা হয়েছে। ৩১টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ এবং 'ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এর সমন্বিত ডেটাবেইসে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৯ লাখ ৪৮ হাজার শ্রমিকের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫] তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হেল্পলাইন বা হটলাইন চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের হেল্প লাইনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট অভিযোগের ২৭ শতাংশ এবং ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন করখানার বিরুদ্ধে ৪ হাজার ৪০৪টি মামলা দায়ের করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪ শতাংশ এবং বিজিএমইর অভিযোগ নিস্পত্তি সেলে ২০১৬ ও ২০১৭ সাল পযর্ন্ত ৯৭ দশমিক ৫১ শতাংশ অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়।[৬] বিজিএমইএ অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার ২৪ জন শ্রমিকের প্রায় ৩ কোটি ৭৭ লাখ পাওনা টাকা কারখানার মালিকদের কাছ থেকে আদায় করেছে।

কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগের আওতায় প্রায় ৪ হাজার ৩৫৬টি কারখানার প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত কারখানার মোট ২ হাজার ৮০টির (৬৮ শতাংশ) সংস্কারকাজে অগ্রগতি হয়েছে। শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি পোশাকপল্লি (২০১৭) স্থাপনের জন্য সরকার ৫০০ একর জমি বরাদ্দ করেছে।[৭] রানা প্লাজা দুর্ঘটনা থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৭৮টি নতুন কারখানা তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রায় ৬ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। জাইকা কর্তৃক কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকা, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি)-এর ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান মেয়াদ পূর্ণ পরিদর্শন ও রিমেডিয়েশন কার্যক্রম টেকসই করণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আইএলওর সহযোগিতায় আরসিসি (রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল) গঠন করা হয় এবং ১৪ মে ২০১৭ সালে আরসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক ও বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর) ও তিনটি টাস্কফোর্সের (অগ্নি, ভবন ও বিদ্যুৎ) সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আরসিসির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইএলও কর্তৃক একটি তহবিল গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

সারণি ১ : কারখানার সংস্কার কার্যক্রম

মূল্যায়ন	অ্যাকর্ড (কারখানার সংখ্যা)	অ্যালায়েন্স (কারখানার সংখ্যা)	জাতীয় উদ্যোগ (কারখানার সংখ্যা)	মোট
প্রাথমিক তালিকাভুক্ত	২,০৯৬	৮৫০	১,৫৩৯	৪,৪৮৫
প্রাথমিক পরিদর্শন	২,০২২	৭৮৫	১,৫৩৯	৪,৩৪৬
পরিদর্শন হয়নি	৭৫	০	০	৭৫
তালিকা পরিবর্তন	৪০		১৯৬	২৩৬
ব্যবসা বা কারখানা বন্ধ	৩৫০	১৬৫	৫৯৭	১,১১২
বর্তমান ফলোআপভুক্ত কারখানা	১,৬৩১	৬৮৫	৭৪৫	৩,০৬১
অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে (১০০ ভাগ)	১৪২	২৩৪	০	৩৭৬ (১২%)
অগ্রগতি চলমান (৭০ থেকে ৯০ শতাংশ)	১,৩১৮	৩৮৬	০	১,৭০৪ (৫৬%)
ধীর অগ্রগতি (শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ)	১৭২	৬৫	৭৪৫	৯৮২ (৩২%)

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

সরকার কর্তৃক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২০১৭ সালে 'মজুরি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে এবং মজুরি পর্যালোচনা চলমান রয়েছে। প্রায় ৯৮ শতাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় সরকারনির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান করছে। সরকার কর্তৃক আইনের মাধ্যমে ২ ঘণ্টার বেশি অতিরিক্ত কর্মঘণ্টায় কাজ না করানো, কারখানায় কর্মকালীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ৫ হাজার শ্রমিক আছে এমন কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়। অপরদিকে, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য পরিচালিত শ্রমকল্যাণকেন্দ্র ২৯ থেকে ৩২টিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে সহজে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা' নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে।[৮] সরকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বিমার সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রমিকের দুর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাভেদে ২০-২৫ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের বিধান করে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯২টি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী এ পর্যন্ত মোট ৫০০টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।[৯] আবার শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩-এ কারখানা পর্যায়ে পার্টিসিপেটরি কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে মনোনায়নের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে

পার্টিসিপেটরি কমিটির সদস্য নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত কারখানাগুলোতে ৮৫০টি পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১০]

শুদ্ধাচার নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে জেলা পর্যায়ের সব কার্যালয়ে প্রধান কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে শুদ্ধাচারবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রাজউক কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় সব সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচারচর্চায় মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

আইন, নীতি ও আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

২০১৭ সালের জুনে আইএলওর 'কমিটি অব এক্সপার্ট' কর্তৃক সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ এবং ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬-এর বিভিন্ন বিষয়ে নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ করা হয়।[১১] সরকার এই অভিযোগের ভিত্তিতে, আইন সংশোধনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে এবং ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ সংসদ থেকে প্রত্যাহার করে। পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত অসামঞ্জস্য হলো–আইনের ধারা ২(৪৯) 'মালিক' সংজ্ঞায়নে ব্যাপকতা, ২(৬৫) শ্রমিক সংজ্ঞায়নের পরিসর ছোট করা, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে সংগঠিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধারা ১৭৯(৫) ও ১৮৩(১), স্বাধীনভাবে সংবিধান প্রণয়নে হস্তক্ষেপ ধারা ১৭৯(১), ১৮৮, ধর্মঘট অহ্বানে প্রতিবন্ধকতা ও শাস্তি ধারা ২১১(১)(৩)(৪), ২২৭(গ) ১৯৬ (২) (গ), ২৯১(২)(৩) এবং ২৯৪-৯৬, পক্ষদ্বয় সংক্ষুব্ধ না হলে বাধ্যতামূলক আরবিট্রেশন ধারায় ২১০(১০)-(১২)[১২] অসমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান, যা শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে, অগ্নিনির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪-এর বিভিন্ন ধারায় মালিকপক্ষের আপত্তিতে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং আইনটি দীর্ঘদিন স্থগিত রয়েছে। ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের ১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ফি গ্রহণ করায় সরকার বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস মামলায় বারবার তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রতা এবং আসামিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর পরিচালনায় আইএলওর সহযোগিতায় এসওপি তৈরির গৃহীত উদ্যোগের কোনো অগ্রগতি হয়নি। পদোন্নতিযোগ্য পদের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়ায় এবং বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সরকারি অনুমতি এখনো না পাওয়ার কারণে ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ

পরিদর্শক পদ পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। রাজউকের পরিদর্শক বৃদ্ধির উদ্যোগ এখনো সম্পন্ন না হওয়া ও কিছু ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে এখনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবৈধভাবে ভবনের নকশা অনুমোদনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিল্পাঞ্চলে ১১টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের উঁচু ভবন সংজ্ঞায়নে অসামঞ্জস্যতা দূর না করার কারণে এবং ফায়ার সার্ভিসের ৩৩ মিটার উঁচু ভবনের অগ্নিনির্বাপণের ক্ষেত্রে লজিস্টিকস ঘাটতি থাকার কারণে উঁচু ভবনে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবার প্রচারণার এবং সেবাগ্রহণকারীদের দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনলাইন সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি হচ্ছে না। অপরদিকে, মালিকদের বিবেচনায় সরকার কর্তৃক উৎসে কর নির্ধারণে সঠিক নিয়ম না মানার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অভিযোগ হলো–উৎসে করের ক্ষেত্রে আয়ের ওপর কর কর্তনের পরিবর্তে ক্রয় ও বিক্রয়ের ওপর কর্তনের ফলে মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এ ছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ঋণখেলাপি হিসেবে ২৬ শতাংশ পোশাকশিল্পের মালিকদের নাম দেখা যায়, যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার ও বায়ার সমন্বিত উদ্যোগে এখনো প্রায় ৩২ শতাংশ (৯৮২) কারখানায় আশানুরূপ (শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ নিচে) অগ্রগতি হয়নি। এসব কারখানার অধিকাংশ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। এসব কারখানার অধিকাংশ মালিকদের সংস্কারের প্রয়োজনীয় আর্থিক অক্ষমতা, ৪৪৬টি কারখানা ভাড়া ভবনে হওয়া এবং ইপিজেডে অবস্থিত ১২টি কারখানার সংস্কারে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা না পাওয়ায় কারখানার সংস্কারকাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সংস্কার করার ক্ষেত্রে বায়ার ও সরকারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারখানার সংস্কার করার জন্য সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকলেও সঠিক কৌশলগত চুক্তির প্রক্রিয়া না থাকার কারণে আর্থিক সহযোগিতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে এসব ভবন সংস্কারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে প্রায় ১ হাজার ২০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে, যার মধ্যে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত ৩০৯টি এবং জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত ৫০৯টি কারখানা (পরিদর্শিত কারখানার প্রায় ২৬ শতাংশ) রয়েছে। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে প্রায় ৪ লাখ শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। আইনে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২টি কারখানার ৬ হাজার ৬৭৬ জন শ্রমিক ব্যতীত কোনো শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাননি। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন আচরণের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির অভিযোগ রয়েছে। আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। আইএলওর

আর্থিক অনুদান নিশ্চিত না হওয়ায় ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি আরসিসির সংস্কার বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে, তেমনি পোশাকমালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসির ওপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিকপক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে; যা কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে টেকসই অগ্রগতিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে।

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট কারখানা ও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোতে ন্যূনতম মজুরি প্রদান না করা, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পরে কারখানায় উৎপাদনে অসম্ভব টার্গেট স্থির করা, মজুরি কর্তন, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টা করা, অনেক ক্ষেত্রে ৫-৬ ঘণ্টার অতিরিক্ত কর্মঘণ্টায় কাজ করানো ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে অত্যধিক কাজের চাপে শ্রমিকদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। বিধান অনুযায়ী মজুরি বোর্ডে সর্বাধিক ফেডারেশন আছে এমন কনফেডারেশনের এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের নিয়ম মানা হয়নি। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিকীকরণের অভিযোগ রয়েছে। সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতি-সুবিধা প্রদান না করা, সরকারনির্ধারিত প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদান না করে কম ছুটি প্রদান করা, প্রসূতি-পূর্বে প্রাপ্ত মজুরি প্রদানের নিয়ম না মানা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসূতিকালীন চাকরিচ্যুত করা, প্রসূতি-সুবিধা নির্ধারণে রাষ্ট্রের অসম আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। শ্রম বিধিমালা ২০১৫ কার্যকর হওয়ার প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ১৬ শতাংশ কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, পার্টিসিপেটরি কমিটি কাগজনির্ভর ও অকার্যকর হওয়া, কারখানাপর্যায়ে মাত্র ৩ শতাংশ ইউনিয়ন কার্যকর, যার কিছু আবার মালিকপক্ষের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্বে কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের চাকরিচ্যুতি, শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে শ্রমিকের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার বাস্তবিক অর্থে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে, বিধান অনুযায়ী কারখানাপর্যায়ে সব শ্রমিকের গ্রুপ বিমা না করা, শ্রম বিধিমালায় কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধাকালীন তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান করার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিকদের নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণবিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১) স্বাক্ষর না করা এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনাপরবর্তী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ ভেঙে যাওয়ায় সময়োপযোগী

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সম্ভাবনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আইন অনুযায়ী, কারখানার সংস্কারে শ্রমিক চাকরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সর্বোপরি, বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে বর্তমানে কারখানাগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে, যা কারখানা বন্ধের শামিল।

শুদ্ধাচার নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারচর্চায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এ ক্ষেত্রে এখনো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে **১০-১৫** হাজার টাকার নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ তদন্তে কারখানার মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে শ্রমিকের নিপীড়নের শিকার ও চাকরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়; যা প্রকৃতপক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

উপসংহার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার আগে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি ছিল, দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসা ধরে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে, শ্রমিকের চাকরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সংগঠন করার অধিকার, মারাত্মক অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি।

রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। আবার, আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বিকভাবে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তাকে ফলপ্রসূ ও সফল করার জন্য সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর তা হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প বিশ্বে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য টিআইবি নিচের সুপারিশ পেশ করছে :

সুপারিশ

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

২. শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে–

- দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য তুলনাযোগ্য দেশের চর্চা বিবেচনায় মানসম্মত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে (কম্বোডিয়া নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা, ভিয়েতনাম মূল বেতন ও প্রাপ্ত সুবিধার ৩০ গুণ প্রদান, ভারত ৫ দশমিক ৪৮ লাখ রুপি, পাকিস্তান ৪ লাখ রুপি)।
- প্রসূতিকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহ করতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে অন্যান্য তুলনাযোগ্য দেশের চর্চা বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা এবং তা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে (ভারত–একই প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম সাতজন শ্রমিক, কম্বোডিয়া–ন্যূনতম ১০ জন শ্রমিক, ভিয়েতনাম–ন্যূনতম ৫ জন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারেন)।
- কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে।
- আরবিট্রেশন কাউন্সিল তৈরির বিধান সংযোজন করতে হবে।

৩. বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শ্রমিক সংগঠনভুক্ত কনফেডারেশন এবং এ খাতে কর্মরত প্রতিনিধির সমন্বয়ে মজুরি বোর্ড গঠন নিশ্চিত করতে হবে এবং বোর্ড কর্তৃক আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়মিত ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনা ও পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

৪. অন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের চর্চার বিবেচনায় বর্তমান মজুরি বোর্ড কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনা ও পুনর্নির্ধারণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিকটতম জিডিপি পার ক্যাপিটাল পিপিপি বিবেচনায় কম্বোডিয়ার তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরির আলোকে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি ২০২ ইউএস ডলার সমপরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিষয়টি সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

৫. দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়ের করা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬. মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এসব কারখানার মালিকদের কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সব বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে হবে।

৯. রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে–
   - সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসির আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
   - আরসিসির কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
   - আরসিসির কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] টিআইবি, 'তৈরি পোশাক খাত : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৩)।

[২] টিআইবি, 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৪)।

[৩] টিআইবি, 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় (এপ্রিল, ২০১৫- মার্চ, ২০১৬)', (ঢাকা : টিআইবি, ২০১৬)।

[৪] *দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'এক্সপোর্ট সোর্স ট্যাক্স কাট টু ০.৭%', ৮ আগস্ট ২০১৭।

[৫] বিজিএমইএ, এপ্রিল ২০১৮।

[৬] *প্রাগুক্ত*।

[৭] *দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'বিজিএমইএ টু গেট ৫০০ একরস অব ল্যান্ড ইন মিরসরাই ইজেড ফর আরএমজি পার্ক', ২২ মার্চ ২০১৮।

[৮] শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য, মার্চ ২০১৮।

[৯] *প্রাগুক্ত*।

[১০] *প্রাগুক্ত*।

[১১] www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/...to.../index.htm (১৮ ডিসেম্বর ২০১৭)।

[১২] *প্রাগুক্ত*।

গবেষক পরিচিতি

অমিত সরকার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থা (জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ), মানব পাচার, সাইবার, বহুজাতিক অপরাধ ইত্যাদি।

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন গবেষক ও মূল্যায়নকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তিনি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় (যেমন সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, নারী ও যুবাদের কার্যকর নাগরিক হিসেবে তৈরি, সামাজিক জবাবদিহি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, এনজিও খাতে সুশাসন, কমিউনিটি পর্যায়ে আইনগত সহায়তা, পানি-স্যানিটেশন-স্বাস্থ্যবিধি, টেকসই চিংড়ির চাষ ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি অ্যাকশনএইড, ব্রিটিশ কাউন্সিল, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন।

কুমার বিশ্বজিত দাশ

ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ অন্যান্য গবেষণার সঙ্গে জড়িত।

জাফর সাদেক চৌধুরী

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড পরিচালনা করেছেন। পাশাপাশি জাতীয় খানা জরিপ, বেইজলাইন জরিপসহ বিভিন্ন গবেষণায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার, সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত, বিচার বিভাগ ও ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে জড়িত।

নাহিদ শারমীন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান।

নীহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নীহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

ফাতেমা আফরোজ

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যাপরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

মো. আলী হোসেন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, বেইজলাইন জরিপ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পাসপোর্ট সেবার ওপর গবেষণা, টিআইবির জাতীয় খানা জরিপে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশন, ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, প্ল্যান বাংলাদেশ, ডব্লিউএফপি, নিপোর্ট, আইএসআরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত কিশোরী ক্ষমতায়ন, শিশু সুরক্ষা, পল্লি দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য, কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, দুর্যোগ-পরবর্তী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবনমান এবং শিশুশ্রম বিষয়ের ওপর একাধিক গবেষণা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মো. ওয়াহিদ আলম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং লি কান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে মাস্টার্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে ভূমি খাতের ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় পর্যায়ের সেবা খাত উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মো. খোরশেদ আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় টিআই নেপালে দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, সমুদ্রবন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেইজলাইন জরিপ পরিচালনাসহ জাতীয় খানা জরিপ ও টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

মো. জুলকারনাইন

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. মোস্তফা কামাল

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততাব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানব পাচার এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য।

মো. শহিদুল ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিভাগ থেকে 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব গুড গভর্নেন্স : আ স্টাডি অব এরশাদ রেজিম' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে 'উন্নয়ন পরিকল্পনার' ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করছেন। তার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সুশাসন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। টিআইবি ছাড়াও তিনি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে কাজ করেছেন।

মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার

পেশাগতভাবে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি টিআইবিতে গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার পদে দীর্ঘদিন সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাহমুদ হাসান তালুকদার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর-পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক এবং হংকং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। নগর পরিকল্পনা ও সুশাসন খাতে তার বেশ কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা রয়েছে। বর্তমানে তিনি সেভ দ্য চিলড্রেনে ম্যানেজার-এমআইএস পদে কর্মরত।

মোহাম্মদ নূরে আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় সংসদ এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততাব্যবস্থা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে সহায়তা করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে ‘বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক আটটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের নবম সংকলন ২০১৯ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

9789843460226